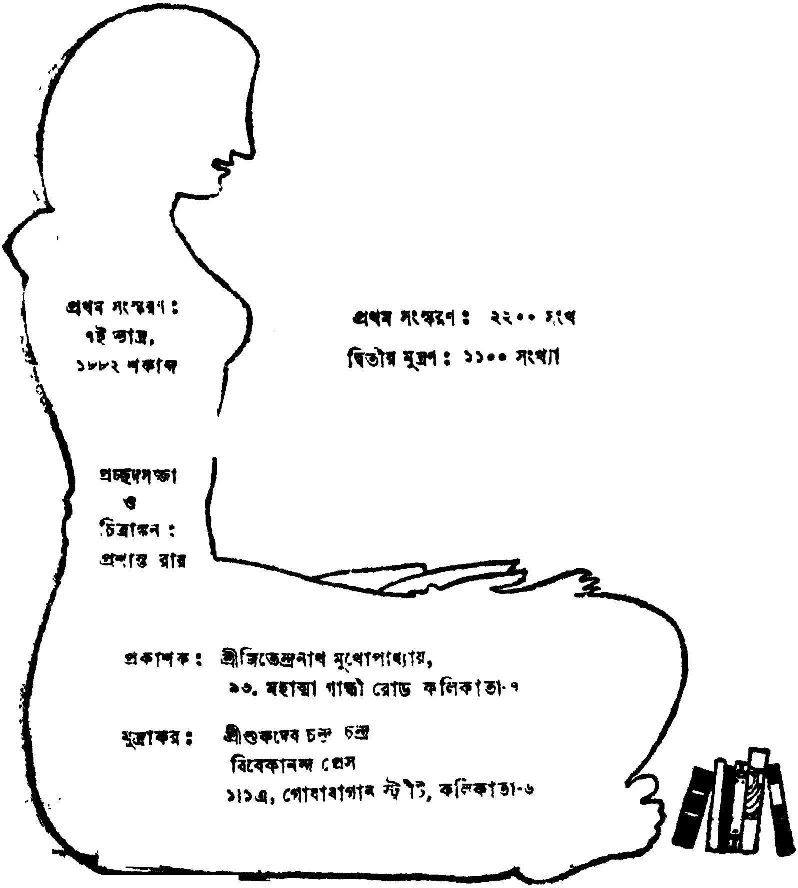
বকধার্মিক

বকধার্মিক

লীলা মজুমদার

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭



প্রথম সংস্করণ :
৭ই ভাদ্র,
১৮৮২ শকাব্দ

প্রথম সংস্করণ : ২২০০ সংখ্যা
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১১০০ সংখ্যা

প্রচ্ছদসজ্জা
ও
চিত্রাঙ্কন :
প্রশান্ত রায়

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীশুকদেব চন্দ্র চন্দ্র
বিবেকানন্দ প্রেস
১১১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

পরম স্নেহাস্পদ

জয়ন্ত চৌধুরীকে

দিলাম



এক

ছোটবেলায় পাহাড়ের দেশে থাকতুম। সেখানে বাড়ির পেছনে ঢালুর নিচে নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে ছলছল করে পাহাড়ী নদী বয়ে যেত। সরল গাছের বনের মধ্যে দিয়ে হু হু করে হাওয়া বইত। রাতে নদীর ধারে ধারে ঝোপে ঝাপে হাজার হাজার জোনাকি জ্বলত।

ছোট শহর ; চা বাগানের সাহেবরা অনেকে সেখানে বাড়ি নিয়ে মাঝে মাঝে থেকে যেত। ইস্কুল, ক্লাব, হাসপাতাল, আপিস, আদালত ব্যাঙ্ক, জেলখানা সবই ছিল। তবু লোকে বলত এখানে কখনো কিছু হয় না। বাড়ির দরজা খুলে রেখেই বেড়াতে বেরুত, সই না নিয়ে টাকা ধার দিত, নগদ পয়সা দিয়ে কেউ কিছু কিনত না, মাস কাবারে মাইনে পেলে যে যার ধার শোধ করে দিত।

সবাই সবাইকে চিনত সেখানে, কাউকে বলত খুড়ো, কাউকে বলত দাদা। ম্যাজিস্ট্রেটকে সবাই ভয় করত ; দারোগাবাবু, পোস্টমাস্টার ইস্কুলের হেডমাস্টারকে খাতির দেখাত ; হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে ভালোবাসত।

সবাই সবাইকে চিনত সেখানে ; মাঝে মাঝে ঝগড়াঝাঁটিও হত, তবু কারো বাড়িতে কোনো কারণে খাওয়া-দাওয়া হলে, পাড়াসুদ্ধু সকলের ডাক পড়ত।

তখন দিন-কাল ছিল ভালো, ঘিয়ের সের টাকা টাকা, দুধ ছিল টাকায় সাত সের, মিলের কাপড় তিন টাকা জোড়া। তবু জেলখানা খালি থাকত না। কোথায় কে জুয়ো খেলেছে, নেশা করেছে, গাঁট কেটেছে, তাদের ধরে এনে, হাজতে জিম্মা করে দেওয়া হত। তাদেরি বলা হত দাগী চোর ; ছাড়া পেয়ে পথ দিয়ে হেঁটে গেলে, লোকে তাদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত। মাথা নিচু করে হাঁটত তারা।

সেই সময়কার কথা।

হঠাৎ একদিন সব পাল্টে গেল। তার আগের দিন সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত কোনো কিছু জানা নেই, যেমনকে তেমন সব চলেছে। সকালবেলাও নাপিতরা রোজকার মতো খেউরি করতে বেরিয়ে, এ বাড়ির খবর ও বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে।

আপিস যাবে বলে আমাদের পাড়ার জগদীশদা স্নান সেরে চুল আঁচড়াচ্ছে, এমনি সময় ওর পিসিমা আলমারি খুলে একটা সোনার কৌটো বের করে বললেন, এটাকে কখনো দেখেছিস্? এর ইতিহাস শুনেছিস্?

জগদীশদা তো থ! গোল গোল চোখ করে বলল, ইস্, পিসিমা, এদ্দিন কোথায় রেখেছিলে এ জিনিস? পেলে কোথায়?

পিসিমা কাষ্ঠ হেসে বললেন, এত ভালো জিনিস এ পাপের সংসারে আর সদুপায়ে পাওয়া যায় ভেবেছিস্? আমার বাবা এটাকে জুয়ো খেলায় জিতেছিলেন।

জগদীশদা হাত বাড়িয়ে বললে, দেখি, দেখি কি রকম জিনিস। আরে এ যে নস্যির কৌটো দেখছি। বাবা! সোনা দিয়ে গড়া, তার ওপর লাল সবুজ পাথর বসানো! কিন্তু ঢাকনির এখানে ছ্যাঁদা কেন, পিসিমা? নস্যি পড়ে যাবে যে!

পিসিমা বললেন, আরে ঐখানে যে স্ক্রুপ দিয়ে একটা হীরের প্রজাপতি বসানো ছিল।

জগদীশদা বললে, কই, কই সেটা?

পিসিমা একটু চুপ করে থেকে বললেন, কি জানি।

জগদীশদা তখন খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলল, তোমার কাছে এত দামের জিনিস আছে, তবু, তুমি কেন আমি মাইনে পেলেই খালি খালি টাকা দাও টাকা দাও কর?

পিসিমা তো অবাক!

ওমা, সেকি আমার নিজের জন্যে বলি রে? সব তো প্রায় তুই-ই খাস্। আর এটাকেও কি আমার নিজের জন্যে রেখেছি নাকি? তোর বৌ এলে, এতে সিঁদুর ভরে তাকেই দেব মনে করেছি।

জগদীশদা ফুটো দেখিয়ে বললে, কিন্তু ঐখান দিয়ে সিঁদুর পড়ে যে বৌয়ের শাড়িতে মেখে একাকার হবে। প্রজাপতিটা কই?

পিসিমা তার কোনো উত্তর না দিয়ে, দেরাজ থেকে ছোট্ট এক টুকরো লাল সালু বের করে, তাই দিয়ে কৌটোটাকে বেশ করে মুড়ে, জগদীশদার হাতে দিলেন।

ত্যাখ্, এটাকে আর বাড়িতে রাখতে সাহস হচ্ছে না, তুই বরং আপিসে টিফিনের ছুটি হলে, ওটা ব্যাঙ্কেই জমা দিয়ে দে। খুব সাবধানে রাখিস্ কিন্তু, এর দাম শুধু টাকা পয়সা দিয়ে নয়। কে জানে এর জন্যে হয়তো আমার বাবা বেচারিকে নরক ভোগ করতে হচ্ছে। সে যাক গে; কিন্তু খবরদার, ব্যাঙ্কের লোহার দেরাজে তালাচাবি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত, এক মিনিটের জন্যেও একে হাতছাড়া করবি নে।

জগদীশদা পুঁটলিটাকে প্যাণ্টের পকেটে পুরতে পুরতে বলল, আচ্ছা, আচ্ছা, আর বলতে হবে না।—আমার বৌকেই দেবে তো ঠিক? শেষটা—

পিসিমা চটে গেলেন।

তোর বৌকে দেব না তো আবার কাকে দেব? তুই ছাড়া আর তিন কুলে কে আছে রে আমার?

জগদীশদা কাগজপত্র গুছোতে গুছোতে হেসে বলল, থাকলে তো আমি বাঁচতুম।

পিসিমার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। না রে জগদীশ, হাসিঠাট্টার কথা নয়। শুনেছি যার কাছ থেকে বাবা ওটাকে জিতেছিলেন, সে নাকি প্রতিজ্ঞা করেছিল, যেমন করেই হোক, নাতনীর বিয়েতে ঐটেকেই যৌতুক দেবে।

তুই বলিস কি রে জগদীশ, এদ্দিনে তার বিয়ের বয়েস হয়ে গেছে। ওটাকে আর বাড়িতে রাখা নয়।

তারপর দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে জগদীশদাকে রওনা করে দিতে দিতে আরো বললেন, ছ্যাখ দিকিনি অন্যায়টা! কি এমন দোষ করেছিলেন বাবা বেচারি? যারা জুয়ো খেলবে তারাও যদি একটু-আধটু জোচ্চুরি করতে না পেল, তা হলে জোচ্চুরিটা করবে কে, তুই-ই বল? • তাই বলে অমন কথা! কম পাজী তো নয় লোকটা!

আপিসে সেদিন খুবই কাজের তাড়া ছিল, তবু তারি মধ্যে, থেকে থেকে জগদীশদা প্যান্টের পকেট চাপড়ে বার বার দেখেছিল কৌটো ঠিক আছে অথচ ব্যাঙ্কে গিয়ে, পকেট থেকে পুঁটলি বের করে জগদীশদার চক্ষু স্থির কোথায় গেল সেই সালুতে মোড়া ঢাকনিতে ছ্যাদাওয়ালা সোনার কৌটো এ যে একটা ন্যাকড়ায় জড়ানো কিমামের শিশি!

তারপর হাঁক-ডাক, থানা-পুলিশ, খানাতল্লাশি। কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হোল না। সোনার কৌটো কর্পূরের মতো উড়ে গেল!

এ সমস্ত ঘটনা পরে জগদীশদার নিজের মুখ থেকে শোনা।

আর শুধু কি সোনার কৌটো? সেদিন থেকে আমাদের ছোট শহরে যেখানে কখনো কিছু ঘটে না বলে লোকে আক্ষেপ করত, সেখানে যেন ভোজবাজি শুরু হয়ে গেল। সে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবার কথা নয়। যেখানে আগে সবাই দরজা খুলে বেড়াতে যেত, সেখানে আর কারো কিছু রাখবার উপায় রইল না। যার যা ভালো জিনিস, সব বেমালুম চুরি হয়ে যেতে আরম্ভ হয়ে গেল!

অদ্ভুত সব ব্যাপার! বিশেষ করে স্কুলপাড়ায়, যেখানে আমরা থাকতুম। আমাদের শহরটা ছোট হলেও, পাড়াগাঁর মতো নয়। বলেছিই তো আপিস, আদালত, থানা, জেলখানা, ছেলেদের ইস্কুল, মেয়েদের ইস্কুল হোটেল, ক্লাব, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক কিছুরি অভাব ছিল না। রেলগাড়ি

অবিশ্যি ঐসব পাহাড়ে দেশে যাতায়াত করত না. কিন্তু মস্ত একটা মোটর-আপিস ছিল, সেখানে মেলা লোকজনও কাজ করত।

জগদীশদার কৌটো যাবার পরদিনই আমাদের স্কুলের বড়দিদিমণির সেলাই-কলটা গেল। তারপর দু চার দিন পর পর, গুপেদের হেডমস্টারের টাইপরাইটার, ব্যোমকেশবাবুর দু'দুটো ছাগল, আর পোস্টমাস্টারের সাইকেল উধাও!

সেখানেই থামল না। আমাদের কালেক্টর গুপ্ত সাহেবের দেয়ালঘড়ি, গ্রামোফোন আর বারান্দায় ঝোলানো দশ রকমের অর্কিড ফুলের গাছ লোপাট! এমন কি সেগুলোকে পাহারা দেবার জন্য গুপ্তসাহেব যে হলুদ রঙের ডালকুত্তো কিনেছিলেন, যার ভয়ে বাড়ির লোকেরা পর্যন্ত কেউ নিচু হত না, কারণ নিচু হলেই পেছন দিক থেকে তেড়ে এসে একাকার করত—সে কুকুরটা পর্যন্ত নেই।

পুলিসে আর কি করবে? শোনা গেল থানার বড় ঘণ্টাটা আর পুলিসদের চব্বিশটা পেতলের লোটাও নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রথম প্রথম এসব শুনলে আমাদের দারুণ মজা লাগত, কিন্তু শেষটা যখন আমাদের বাড়ি থেকে, আমাদের ভালো কাপড়জামাসুদ্ধ বড় কালো তোরঙ্গটা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন মোটেই হাসির কথা হল না।

সবাই ভারি সাবধানে চলাফেরা করতে লাগল। কিন্তু হলে হবে কি? চোররা আরো সেয়ানা। ডাক্তারবাবু বললেন, আর সেয়ানা হবে নাই বা কেন? বোকা হলে তো সৎপথেই থাকত!

এমন কথা শুনে মা-জ্যেঠিমারা খুব বিরক্ত হয়েছিলেন।

তারপর কত কাল কেটে গেছে, তবু এখনো সে-সব কথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। আমার জ্যাঠতুতো ভাই নেপু বলেছিল যে পিসির কাছে তাড়া খেয়ে, জগদীশদা নাকি তিনজন সাক্ষী ডেকে, তামা তুলসী গঙ্গাজল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে চোর সে ধরবেই, সে যেমন করেই হোক। তাই নিয়ে

রাত্রে ওরা লুচি মুর্গি রেঁধে খাওয়া-দাওয়া করেছিল ; তাই আর এখন কথার নড়চড় হবার যো নাই।

সে সময় শহরের মধ্যে যেখানেই যাও না কেন, সবখানেই ঐ এক কথা, কে নিল, কে নিল, কেমন করে নিল, কোথায় রাখল।

আমাদের স্কুলের মেয়েরাও টিফিনের সময় রোজই খুব জটলা করত। একদিন ইন্দুদি দেখলুম খালি হাতে ক্লাশে ঢুকলেন। এসেই বললেন, মেয়েরা, তোমরা সময় থাকতে সাবধান হও। পরে আপসোস করে কোনো লাভ হবে না।

শুনেই তো আমরা যে যার চুড়ি, বালা, গলার হার আর কানের ইয়ারিং খুলে, ইন্দুদির ডেস্কে চাবি বন্ধ করে ফেললুম। তারপর টিফিনের সময় সবাই মিলে ডালিম গাছের নিচে খাবার টাবার খেলুম, গাল-গল্প করলুম। ফিরে এসে যখন ডেস্ক খোলা হল, দেখা গেল, ওমা কি সর্বনাশ, গয়নাগাঁটি হাওয়া!

আমাদের নতুন বড় দিদিমণি, লাবণ্যদি তাই নিয়ে মহা গোলমাল করলেন। ইন্দুদি কেঁদেকেটে একাকার ; বাড়িতেও বকাবকি। থাক, সে সব কথা ভেবে কোনো লাভ নেই।

রাত্রে খেতে বসে, নেপুর যেমন স্বভাব, ফোঁপরদালালি করে বলল, আমাদের অপূর্বদা বলছিলেন, এ সমস্ত কোনো ফন্দিবাজ মেয়ে চোরের কাজ। এতটা নীচ, ছোটলোক আর ধূর্ত হওয়া শুধু স্ত্রীলোকেরি সাজে।

রাগে আমার গা জ্বলে গেছিল। কিন্তু আমাকে আর কিছু বলতে হয় নি। মা, জোঠিমা আর অরুণা বৌদি বাছাধনকে আচ্ছা করে দু কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

সত্যি, ওদের ঐ অপূর্বদাটি একটি দেখবার মতো জিনিস। ইয়া লম্বা-চওড়া, তার ওপর গা-ময় পাকানো পাকানো দড়ির মতো সব মাস্‌ল, এই কুটি কুটি ছোট্ট করে চুল কাটা, কিন্তু কান পর্যন্ত টানা গোঁফ! নেপুটাকে একরকম অপূর্বদার চেলাই বলা যায়, নেহাত গোঁফটা গজায় নি।

জ্যেঠিমা নেপুকে বললেন, পাকামো রাখ, ঐ অতবড় তোরঙ্গ, গ্রামোফোন সরানো মেয়েমানুষের কাজ না আরো কিছু। ও সব পাচার করতে একটা ষণ্ডামার্কা পুরুষ মানুষের দরকার।

অরুণাবৌদি বললেন, আর তার গোঁফ থাকলে তো কথাই নেই!

নেপু রেগে চটে পাতে দুখানা গোটা হাতের রুটি ফেলেই উঠে চলে গেল।

বড়দা একটু হেসে বৌদিকে বললেন, ওরকম বলতে হয় না। নেপুরা তা হলে তোমার নামে মানহানির মামলা করবে!

যাই হোক, চারিদিকে কত রকম জল্পনা-কল্পনাই চলতে লাগল, তার ঠিক নেই। শেষ পর্যন্ত এমন হল যে সবাই সবাইকে সন্দেহ করতে লাগল।

একদিন ডাক্তারবাবুর গাড়ি থামিয়ে নতুন পুলিশ ইন্সপেক্টর ওঁর ব্যাগ তল্লাশি করলেন। ডাক্তারবাবু হাঁ হাঁ করে তুলোর প্যাকেট সরিয়ে রাখাতে, সন্দেহজনক লোকদের তালিকায় ওঁর নামটাও লিখে রাখলেন। পরে অবিশ্যি দারুণ পেটব্যথা হওয়াতে ডাক্তারবাবুর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন।

সে যাক গে, এইভাবে বেশ দু তিনটে মাস কেটে গেল, একটা জিনিস বা একটা লোক ধরা পড়ল না।

দুই

বলেছি তো আমাদের শহরটা ছিল পাহাড়ে, দারুণ শীত পড়ত সেখানে। রাতে লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে শুয়ে শুনতুম বাড়ির পেছনে, ছোট নদীর ওপারে, সরকারী জঙ্গলের মধ্যে শীত লেগে হুতুম প্যাঁচা ডাকছে। দূরে দূরে থেকে থেকে ক্যা-হুয়া ক্যা-হুয়া বলে শেয়াল চ্যাঁচাত। বাড়ীর টিনের ছাদ সারাদিন রোদে তেতে, রাতের ঠাণ্ডায় মট্‌মট্ করত।

কিন্তু এসব শব্দের চেয়েও স্পষ্ট শুনতে পেতুম কারা যেন বাড়ির বাইরে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

একদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর, ছুটে বেরিয়ে গিয়ে এক ব্যাটার গলা টিপে ধরেও ছিলেন। সে কিন্তু মহা কাঁাও ম্যাও লাগাল, সে নাকি বাবার বন্ধু গোপেনবাবুর নতুন চাকর, কি চিঠি নিয়ে এসেছে। বেরও করে দিল একটা চিঠি. শেষ পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দিতে হল।

সত্যিকার চোর আর কেউ চোখেও দেখল না। অথচ কমিশনার সাহেবের বাগানের সমস্ত আলুগাছ রাতারাতি কে উপড়ে নিয়ে চলে গেল। তাতে আলু কত! এক একটা গাছেই কুড়ি বাইশটা করে। এর জন্য থানার ইন্‌চার্জ কোন অজ পাড়াগাঁয়ে বদলি হয়ে গেলেন, কিন্তু চোর ধরা পড়ল না।

তাঁর বদলে যিনি এলেন, তিনি এসেই শহরে নতুন যারা আসছে আর পুরোনো যারা বেরিয়ে যাচ্ছে, সবাকার নাম ধাম পেশা টুকে রাখলেন।

প্রতি বছর এই সময় শীতের মুখে, জগদীশদার পিসিমার গুরুদেব এসে দশ-বারো দিন লুচি পাঁঠা ক্ষীর সর খেয়ে মোটা হয়ে, দুখানি নতুন কম্বল নিয়ে চলে যান! এ বছর যেই না টিকিসুদ্ধ দেখা দিয়েছেন, অমনি ক্যাঁক্ করে পুলিশরা ধরেছে তাঁকে।

আমাদের ক্লাশের সব চাইতে ভালো মেয়ে পুঁটি, জগদীশদাদের পাশের বাড়িতে থাকে। সে বললে গুরুদেবকে ধরাতে পিসিমার সে কি রাগ!

'আমার অমন সোনার ডিবে গেল, বলে তারি শোকে মলাম! আবার কি না শ্রীভগবানকে ফাটকে দিয়েছে! এমন দেশে চুরি হবে না তো হবে কোথায় শুনি! দেখো, কেউ ধরা পড়বে না, কিচ্ছু পাওয়া যাবে না, আমার সোনার ডিবেও না। হাউ হাউ।

যখন সত্যি সত্যি বেশ কিছুদিন কেটে গেল, তখন একদিন কমিশনার সাহেবের বাড়িতে সকলের নেমন্তন্ন হল। বাগানের মধ্যিখানের খোলা জায়গাটিতে ছেঁড়া শতরঞ্জি পেতে বসিয়ে, চা আর আলুভাজা খাইয়ে দেওয়া

হল। তার পর সকলে মিলে ঠিক করা হল যে এ আর একা পুলিশের কম্ম নয়, শহরসুদ্ধ সবাইকে কাজে নেমে যেতে হবে।

মিটিং করতে করতে সন্ধ্যে হয়ে এল, দাঁড়কাকরা গাছে ফিরে এল, সূর্যি ডোবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার নেমে এল।

বাড়ি ফেরবার পথে বাবা শশীবাবুর দোকান থেকে একটা লম্বা খাতা কিনে, ঘরে ঢুকেই আমার নতুন সবুজ কলমটা চেয়ে নিয়ে, চোর ধরবার লোকজনদের নাম লিখতে বসে গেলেন। কলমটা দিয়ে আবার গলগল করে কালি বেরুত, সে সব নতুন খাতায় মেখেটেখে একাকার, বাবা তো রেগে কাঁই!

শেষটা পেনসিল দিয়ে লিখতে হল। নেপু আর আমি স্কুলে নাম দেব বলে আমরা ছাড়া আর সকলের নাম ১নং ২নং করে লেখা হল।

আমাদেব শঙ্কর ঠাকুর নাম লিখিয়ে সটান নিজের ঘরে গিয়ে বাক্স প্যাঁটরা বাঁধতে লেগে গেল। বলে, 'আজ নাম্অ লিগিলুঁ কাল ধরি নিলুঁ!' আধ ঘণ্টা ধরে মা আর জ্যেঠিমা ওকে বোঝাতে লাগলেন। পরে অবিশ্যি খুশি হয়ে মাছকাটা বঁটি নিয়ে শুল।

পরদিন নেপু ইস্কুল থেকে ফিরেই বলল, অপূর্বদারা প্রমাণ পেয়েছেন এ সব কোনো মেয়ের কাজ, তোদের মাস্টারনীদের সাবধান হতে বলিস্।

আমিই বা ছেড়ে দেব কেন, একটা মান-সম্মান আছে তো? কাজেই বললুম, যার বিশে ডাকাতের মতো চেহারা তাকে অত কথা বলতে বারণ করিস্।

নেপু রাগে ফুলতে ফুলতে বলল, তোদের লাবণ্যদিদিকে ওয়ার্ন করে দিস্।

আমিও রেগে বললুম, অপূর্ব লোকটাকে উইল লিখে রাখতে বলিস্। এই কথাবার্তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে মেয়েদের ইস্কুল আর ছেলেদের ইস্কুলের মধ্যে কি দারুণ রেষারেষি চলছিল।

নেপু হল আবার ওদের দলের সাব-ক্যাপ্টেন। গলায় একটা দড়ি দিয়ে

একটা বাঁশি ঝুলিয়ে বাড়ি এল। দেখে হেসে বাঁচি নে। ওদিকে আমাদের ইস্কুলেও রীতিমতো কাজ শুরু হয়ে গেছে, ছোট ছোট দল বানিয়ে ফেলা হয়েছে। আমি একটা দলের অধিনেত্রী হয়েছি। একটা লাল রেশমি ফিতের ব্যাজও পেয়েছি, আমার পেন্সিল-বাক্সে সেটা লুকিয়ে রেখেছি। নেপুকে দেখাতে ভারি বয়ে গেছে। বাবা! যা হিংসুটে ছেলে, এক্ষুণি তাই নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করবে।

এ সবের মধ্যে আবার শীত পড়ে গেল। নাসপাতিগাছের পাতাগুলো সব লালচে হয়ে ঝরে পড়ে গেল। আর তারই সঙ্গে আমাদের বাৎসরিক পরীক্ষাও এসে গেল। নেপুরা শুনলুম দল বেঁধে ওদের হেডমাস্টারমশায়ের কাছে গেছল, নাকি চোর ধরার হাঙ্গামার জন্য ভালো করে পড়া তৈরি হয় নি, বড়দিনের ছুটির পর পরীক্ষাটা হোক। তাড়া খেয়ে বাবুরা ফিরে এসেছিলেন। ওদিকে চোর ধরার নাম নেই, এদিকে তাই নিয়ে বড়াই কত! আমরাও যে পরীক্ষা পেছোবার কথা ভাবি নি তা নয়, কিন্তু নেপুদের অবস্থা দেখে কথাটা আর পাড়ি নি।

সেকালে বাৎসরিক পরীক্ষার পর বারো দিন বড়দিনের ছুটি থাকত। ভেবেছিলুম তার মধ্যে কাজ হাসিল করতে পারলে কি মজাটাই না হয়।

বাড়িতেও এই সব ব্যাপার নিয়ে বেশ একটা আলোড়ন চলত। বাবা তো খাতায় মা জ্যেঠিমাদের নাম লিখে নিয়েছিলেন। সন্ধ্যেবেলায় জগদীশদার পিসিমা প্রায়ই একটা মোষের মতো রঙের আলোয়ান গায়ে দিয়ে আমাদের বাড়িতে আসতেন। জ্যেঠিমাদের বলে কয়ে বাবার খাতায় তিনিও নিজের নামটা লিখিয়ে নিলেন।

তখন মা জ্যেঠিমাদের কাজ সারা হয়ে যেত, সবাই হাতমুখ ধুয়ে চুলটুল বেঁধে, একটা করে নীল আলোয়ান জড়িয়ে, জ্যেঠিমার শোবার ঘরের তক্তপোশের ওপর গোল হয়ে বসতেন। আজকাল বড্ড শীত পড়ে গেছে, বাগানে আর বসা চলে না।

কত রকম জল্পনা-কল্পনাই না চলত ওঁদের। কোথায় কবে কি চুরি ডাকাতি হয়েছিল তার গল্প শুনে শুনে আমাদের গা শিরশির করত। আবার মাঝে মাঝে বাইরে একটা পাতা খসার শব্দ শুনেই চমকে চমকে উঠতেন সবাই। ও দিদি! ও আবার কেমন ধারা আওয়াজ!

জ্যেঠিমার তো অন্ধকার হলে পর জানালার কাঁচ দিয়ে বাইরে তাকাতেই ভয় করে, উনি আবার চোর ধরবেন! অথচ বয়সে বড় বলে উনিই হলেন ক্যাপ্টেন! মাকে ডেকে বলতেন, মেজবৌ, যা, দেখে আয় কিসের শব্দ।

আমার মা বন্ধ জানালার পর্দাটা আঙুল দিয়ে একটু সরিয়ে টুক্ করে একবার দেখেই বলতেন, কই, কিছু না তো! পাতা খসার আওয়াজ হবে হয়ত।

একদিন ঐরকম জানালার কাছ থেকে ফিরে এসেই জগদীশদার পিসিমাকে বলে বসলেন, তুমি তো দিদি, সব জানো। তবে কেন পুলিশের কাছে কথাটা খুলে বলছ না? ঐ যার কাছ থেকে তোমার বাবা জুয়ো খেলে সোনার কৌটো জিতেছিলেন, তুমিই তো বলেছ যে সেই লোকটা প্রতিজ্ঞা করেছে নাতনীর বিয়েতে ঐ কৌটো দেবেই দেবে। তবে কেন তাকে ধরিয়ে দিচ্ছ না?

মার কথা শুনে বাকি সবাই কাঠ! পিসিমা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, আরে, কি যে বলিস্ পাগলের মতো! সে কি আর আছে যে ধরিয়ে দেব? কোন্ কালে মরে সগ্গে গেছে। পৃথিবীর নিয়মই হল হাড় পাজীরা বেশি দিন কষ্ট ভোগ করে না।

তাই শুনে আমার মা বললেন, আহা, তাকে না পাও, তার ছেলেকে তো জেলে দিতে পারো। সে সুদ্ধু তো আর মরে যায় নি!

পিসিমা বললেন, গেছে রে গেছে। পাজীর গুষ্টি, সব কটা সগ্গে গেছে। এক আছে ঐ নাতি নাতনী গুটিকতক! সব কটা নাকি সমান দুষ্টু!

জ্যেঠিমা বললেন, সেকি! তাদের তুমি চেন নাকি?

চেনবার কিছু দরকার করে না। ও বংশের কেউ ভালো হতে পারে না,

তাই বলছি। আরে বাবা বেচারি না হয় একটু জোচ্চুরিই করেছিলেন, তাতে কি আর এমন হয়েছেটা তাই তোরা বল? কত লোকে তো অমন করে! অথচ সে বুড়ো হতভাগা এমনি করতে লাগল যেন বাবা বেচারি কি অন্যায়টাই না করেছেন! শেষ পর্যন্ত বেচারাকে কলকাতা ছেড়ে, নাম ভাঁড়িয়ে, এখানে এসে শেষ বয়সে ভগবানের নাম করে দিন কাটাতে হয়েছিল!

মা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তা ঐসব নাতি নাতিনীদের—তা হোলে হাজতে পোরা হচ্ছে না কেন?

পিসিমা রেগেমেগে এবার উঠেই পড়লেন।

কি জ্বালা, তুই তো ভারি বোকা দেখতে পাচ্ছি। পুলিশকে কৌটো হারানোর কথা বলি আর কি! তারপর বাবার জোচ্চুরির কথাটাও ফাঁস হয়ে যাক, তাতে ভালোটা কি হবে শুনি? তবেই আর কৌটো পাওয়া গেছে! তাছাড়া তাদের ঠিকানাও জানি নে।

পিসিমা এবার সত্যি বাড়ি যাবার জন্যে আলোয়ানটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিলেন। যেতে যেতে আবার চাপা গলায় বললেন, জগদীশ একটা নতুন চাকর রেখেছে।

মা জ্যেঠিমারা আঁৎকে উঠে বললেন, না, না, দিদি, আজকাল চারিদিকে যে কাণ্ড হচ্ছে, এ সময় অচেনা লোক না রাখাই ভালো।

পিসিমা হেসে বললেন, তোদের যেমন বুদ্ধি। আরে, আসলে ও হল গিয়ে একটা পাকা গোয়েন্দা। টিকটিকি গো। চাকর সেজে তদন্ত করছে। কই, শঙ্করা আমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসুক তা হলে।

পরদিন টিকটিকিটাকে নিজের চোখে দেখলাম পর্যন্ত। জগদীশদাদের বসবার ঘরের জানলায় পর্দা টাঙাচ্ছে।

কি চালাক দেখতে সে আর কি বলব! কে বলবে গোয়েন্দা, স্রেফ একটা চোরের মতো দেখতে! খুদে খুদে করে চুল ছাঁটা, থ্যাবড়া নাক,

ছোট্ট ছোট্ট চোখ নাক ঘেঁষে রয়েছে, পাশ দিয়ে তাকায়, কুচকুচে কালো গায়ের রং আর এই এই হাতের পায়ের গুলি! আবার পরেছে হাতকাটা গেঞ্জি আর কালো হাফ-প্যান্ট্।

পিসিমা দেখলুম লোকটার ওপর হাড়ে চটা। মাকে বললেন, বকরাক্ষসের সঙ্গে ব্যাটার কোনো তফাত নেই। সারাদিন খালি খাই-খাই। কোনো কিছু তুলে রাখবার জো নেই! কি জানি বাবা, সারাক্ষণ যদি গিলবেই তো চোর ধরবে কখন?

লোকটা দেখলুম ততক্ষণে পর্দা টাঙানো শেষ করে, রান্নাঘরের সিঁড়ির ওপর বসে এই বড় এক ঠোঙা মুড়ি, কাঁচা লঙ্কা আর কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে মেখে বেশ একমনে খাচ্ছে। এমন সময় জগদীশদা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, গুটে কোথায়? এই ব্যাটা, তুই এখানে বসে মুড়ি গিলছিস্ আর মাইনে খাচ্ছিস্, ওদিকে অপূর্ববাবুরা তো সব বের করে ফেলল!

গুটে মুখে আরেক মুঠো মুড়ি পুরে বলল, কি যে বলেন! চোর ধরবে ঐ স্টুপিডটা? ধরে যদি এই শম্মাই ধরবে, কিন্তু একটু না খেলে খাটব কি করে?

ততক্ষণে পিসিমা জেঠিমারা জগদীশদাকে ঘিরে ফেলেছেন।

কি সর্বনাশ! ওমা, অপূর্ব টারো পেটে এত বুদ্ধি! বাইরে দেখতে ঐ ভালো মানুষ! তা কটাকে ধরল? তাদের সব ফাঁসি হবে বোধ হয়?

জগদীশদা রেগে উঠল।

চুরির জন্যে ফাঁসি হয় কখনো! যা বুদ্ধি তোমাদের? চোর ধরা অত সহজ নাকি?

হয়েছে এই যে অপূর্বরা খেলার মাঠের ওপারের জঙ্গলে গিয়ে দেখে চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে শুধু হাড় আর চিবানো মুণ্ডু—কি হল, অমন হাঁ হয়ে গেলে কেন? ব্যাটারা সেখেনে গিয়ে মস্ত ফিষ্টি দিয়েছে, মেলা মুর্গি রেঁধে খেয়েছে। সম্ভবতঃ সব চুরি করা। চারদিকে শুধু হাড় আর লুচির

ঝোড়া আর রসগোল্লার হাঁড়ি। কি রকম সাহস বেড়ে গেছে ভেবে দেখ! বলতে গেলে একেবারে আমাদের দোর গোড়ায় বসে ভোজ মেরেছে আর কন্দী এঁটেছে! এবার কি হয় কে জানে!—আচ্ছা, পিসিমা, তুমি কি সেই সব—।

আর বলতে হল না। পিসিমা বিষম রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, চোপ্, ইডিয়েট! হাটের মাঝে হাঁড়ি কি না ভাঙলেই নয়!.

গুটেটা একেবারে পিসিমার ঘাড়ের কাছে এসে, হাঁ করে সব কথা শুনছিল। পিসিমা বিরক্ত হয়ে নাকে কাপড় দিয়ে বললেন, কাঁচা পেঁয়াজ গিলে এসে আমার নাকের কাছে কি নিশ্বাস না ফেললেই নয়, বাছা?

গুটে একটু সরে দাঁড়িয়ে জগদীশদাকে বললে, দেখুন জগদীশবাবু, আমাকে সব কথা খুলে না বললে কিন্তু চলবে না। তা না হলে আমি তদন্ত করব কি করে?

জগদীশদা বললে, আচ্ছা. আচ্ছা, সে হবে 'খন। তুমি এখন এসো তো!

গুটে কিছুতেই নড়বে না, বলে, আর দেখুন, না হয় চাকরির খাতিরে চাকর সেজেই রয়েছি। তাই বলে আপনার পিসিমার কি উচিত হয় আমার সঙ্গে সত্যিকার চাকরের মত ব্যবহার করাটা? দেখুন, একবার আমার হাতের দশাটা দেখুন। সেই যে সকাল থেকে আমার পেছনে লেগেছেন, এক মিনিটের জন্যে বিরাম নেই! এমন করলে কি করে পারি তাই বলুন?

জগদীশদা পিসিমাকে বললে, আচ্ছা পিসিমা সব জানো, তবু এরকম কেন কর বল দিকি নি! চোর ধরতে পারলে সরকার থেকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে তা জানো? তোমার হরিদ্বার যাবার খরচটা উঠে যাবে।

পিসিমা কিছুতেই বোঝেন না। না বাপু। আমি যাই হরিদ্বারে, আর তোমার গুটে গুণধর বাকি গয়নাগুলো—জগদীশদা ছুটে গিয়ে মুখ চেপে ধরল।

গুটে আরেকটু এগিয়ে এল।

কি কি গয়না, মা-ঠাকরুন ? কোথায় রেখেছেন সেগুলো ? আহা. কিছুই যদি না বলেন তো সে-সব রক্ষে করব কি করে ?

বাকিরা এতক্ষণ হাঁ করে সব শুনছিলেন। পিসিমা কোনো জবাব দিচ্ছেন না দেখে, একটু রাগ করে জ্যেঠিমা বললেন, চল তোমরা, এখানে আর নয়। দেখছ না, আমরা আছি বলে এঁদের কথাবার্তার অসুবিধে হচ্ছে। তা দিদি, তোমাদের ঐসব জুয়োখেলার জিনিসের ওপর আমাদের কোন লোভ নেই। আমার বাবা আমাকে আশি ভরি সোনার গয়না দিয়েছিল, সেই আমার যথেষ্ট। আমি মলে অদ্দেক পাবে মণির বৌ আর অদ্দেক পাবে নেপুর বৌ। তা সে-সব এমনি লুকিয়ে রেখেছি যে আমি নিজে বের করে না দিলে, চোররা কেন, এরাও তার সন্ধান পাবে না। হ্যাঁ।

এই বলে জ্যেঠিমা আমাদের একরকম টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে এলেন। আমার একটুও আসতে ইচ্ছে করছিল না। চোর ধরতে হলে কথায় কথায় রেগে অকুস্থল ছেড়ে চলে যাওয়াটাও কিছু কাজের কথা নয়।

বাড়ি এসে দেখি নেপুটা ভারি লাফাচ্ছে।

পুলিশের লোকেরা কিছু পায় নি, অথচ আমাদের অপূর্বদা কত হাড় গোড় সংগ্রহ করেছেন !

শুনে বেজায় হাসি পেল। তাও যদি নরকঙ্কাল হত ! মুখে শুধু বললুম, রেখে দে তোদের অপূর্বদার আস্ফালন ! কে ওখানে পিকনিক করেছে, তাই দেখে কর্তা নেচে কুঁদে একাকার !

নেপু চটে লাল।

কেউ পিকনিক করে না ঐ বনের মধ্যে। এটা তুই ভালো করেই জানিস্। সবাই জানে ওখানে ভূতের ভয়। বাইরের লোক না হলে ওখানে কেউ খাওয়া দাওয়া করবে না, এটা তুইও বেশ জানিস। ওসব তোর হিংসের

কথা। তোদের লাবণ্যদিদির দিনই কাবার হয়ে যায় চোখে কাজল লাগাতে আর কপালে টিপ পরতে, ও আবার চোর ধরবে! জানিস, কাল সকালে পুলিশের সাহায্যে ঐ বন গোরুখোঁজা করা হবে। সরু চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো হবে। ভূতের বাড়িটা পর্যন্ত একেবারে চষে ফেলা হবে!

বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। কাল সকালে লাবণ্যদিদিদের সঙ্গে আমাদের ইস্কুলের দলও যে চোর খুঁজতে বনে যাবে!

তিন

ঐ পাহাড়ে দেশের সে দারুণ শীতের কথা আর কি বলব! একেবারে হাড়ের ভেতরে ঢুকে যেত। রাত্রে শুতে যাওয়াই ছিল এক ব্যাপার! ঠাণ্ডার চোটে বালিশ বিছানা মনে হত ভিজে সপসপে। একটা গরম জলের ব্যাগ দিয়ে বিছানা গরম করে নিয়ে তবে না শোয়া যেত। আর সকালে ওঠা? সে যে আরো কষ্ট। লেপের ভেতর থেকেই গরম জামা এঁটে, গরম মোজা পায়ে দিয়ে উঠতে হত।

ওদিকে সন্ধ্যে সাতটা না হতেই যেন দুপুর রাত! পথে ঘাটে জনমানুষ নেই। আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো ছিল না। আমরা ছেলে-পুলেরা একঘরে শুতাম আর তারি পাশের ঘরে জ্যেঠিমারা শুতেন। মাঝখানকার দরজা খোলা থাকত, সেখানে টিমটিম করে একটা লণ্ঠন জ্বলত।

মাঝে মাঝে ভাল ঘুম হত না। জল তেষ্টা পেত। কিন্তু উঠতে যত না শীত করত, তার চেয়ে বেশী ভয় করত।

অথচ নেপুর কাছে কিছু বলবার জো ছিল না, অমনি পরদিন তাই নিয়ে সব বাড়িয়ে বাড়িয়ে পাঁচ রকম কথা বলবে। শেষে লাবণ্যদি লতিকাদিদের অবধি টেনে আনবে। কি দরকার বাবা।

সেদিন অনেক রাতে ঘুম ভাঙতেই দেখি ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। আমার

তো গায়ের রক্ত হিম। কান খাড়া করে থাকলাম। ওদিকে গলা শুকিয়ে তক্তা, জ্যেঠিমাকে ডাকি কি করে?

তার ওপর মনে হল কারা যেন কাছেই কোথাও ফিসফিস করে কথা বলছে; কে যেন দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, খস্ করে সরে গেল। কারা যেন বাড়ির আশেপাশে পা টিপে টিপে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আরেকটু হলে ভয়ের চোটে মরেই গিয়েছিলুম আর কি, এমন সময়ে ওধারের দরজা খুলে, লণ্ঠন হাতে জ্যাঠামশাই এসে ওঘরে ঢুকলেন।

জ্যেঠিমা বললেন, ধরলে নাকি?

জ্যাঠামশাই যেন বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

এ কি ক্রিকেট বল নাকি যে ধরব? না না, ওসব তোমার মিছে ভয়। ভজহরি এসেছিল, বললে আমাদের আপিসের পিণ্টো সাহেবের বাড়িতে সার্চ হয়েছে। এদানীং যে সব জিনিস চুরি গেছে তার কোনটাই পায় নি বটে, কিন্তু গত কুড়ি বছরের মধ্যে আমাদের আপিসের যা কিছু হারিয়েছে সব নাকি বেরিয়েছে।

জ্যেঠিমা বললেন, তা ভজহরি এসেছিল কেন?

না, ইয়ে কি বলে, ঐ পিণ্টোর মেম একটু রাগী প্রকৃতির কি না, তাই সার্চ করতে যারা যারা গেছল, তাদের সবাইকে আইডিন লাগাতে হচ্ছে। কিন্তু ভজহরিরা তো অ্যালোপ্যাথিক লাগাবে না, তাই আমার কাছে এসেছিল আর্নিকা নিতে।

জ্যেঠিমা নাক অবধি লেপ টেনে বললেন, শখও আছে বাবা! এই শীতে আর্নিকার খোঁজ কচ্ছে!

জ্যাঠামশাই জুতো ছাড়তে ছাড়তে বললেন, তোমার বাপের বাড়ির কেউ তো আর হোমিওপ্যাথির মর্ম বুঝল না, তাই ঐরকম বল। তবে এও আমি বলে রাখলাম, যদি ঠিক ঠিক ওষুধটি পড়ে, একেবারে ধন্বন্তরী।

এই রকম আরো কি কি সব কথাবার্তা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কাল ছুটি। লাবণ্যদি লতিকাদি আমাদের দলের সাতজন খুব সাহসী মেয়ে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে বেড়াতে যাবেন, একেবারে ভূতের বাড়ি অবধি দেখে আসবেন।

সকাল থেকে সবার মুখে পিন্টো সাহেবের পেজোমি ছাড়া আর অন্য কথা নেই। নেপুর সবটাতেই কিছু বলা চাই, এঘরে এসে বলল, আরে, শুধু পিন্টো কেন, অনেক ওস্তাদের বাড়ি সার্চ করলেই অনেক কিছু বেরুবে।

বলে এমন বিশ্রী করে হাসতে লাগল যে আমার আর বুঝতে বাকী রইল না যে লাবণ্যদিদিদের কথা বলছে।

তবু ওকে কিছু না বলে, মাকে বলে শঙ্করকে নিয়ে লাবণ্যদির বাড়ি চলে গেলুম।

কি সুন্দর বাড়ি লাবণ্যদির আর রেখেছেন কি চমৎকার করে সাজিয়ে! দরজা জানলায় গোলাপী পর্দা, সিঁড়ির দু পাশে ছোট ছোট টবে কত ফুল। সদর দরজা খোলা, ভেতরে বড় বড় দুটো পেতলের ফুলদানি চক্‌চক্ করছে।

আর লাবণ্যদি নিজেও যে কি সুন্দর দেখতে, সে আর কি বলব। মাথায় কত লম্বা, রংটা খুব ফর্সা না হলেও কেমন মোলায়েম, আর এক মাথা কালো কোঁকড়া চুল। নীল একটা শাড়ি পরেছেন, কোমরে দিব্যি করে আঁচলটা জড়িয়েছেন।

আমাকে দেখেই বললেন, বাঃ, এসে পড়েছ, ভালোই হল। সেখানেই খাওয়া দাওয়া হবে বলে এসেছ তো?

শঙ্করদা অমনি সর্দারি করে বলে উঠল, দিদিমণি কিন্তু মোটে ঝাল খায় না। ঝাল খেলেই দিদিমণির পেট—

এমন রাগ হল, খুব কষে ধমক দিলুম, বললুম, আচ্ছা, আচ্ছা, তোকে আর এর মধ্যে নাক গলাতে হবে না। তোর এখানে আর থাকবার দরকার নেই, তুই বাড়ি যা।

কিন্তু সে কিছুতেই যেতে চায় না, মা নাকি সঙ্গে যেতে বলে দিয়েছেন। কি মুশকিল! আমাদের সঙ্গে বাইরের লোক গেলেই বা চলবে কি করে? দেখলুম লাবণ্যদিদির কি বুদ্ধি! চট করে বললেন, তুমিও যাচ্ছ, ভালোই হল। আচ্ছা বেশ, তা হলে আমাদের দশজনের খাবারের টিন আর জলের বোতলগুলো তুমিই বয়ে নিয়ে চল।

তাই শুনে শঙ্করের সব উৎসাহ উড়ে গেল। সে বললে, না দিদি, আমার আবার পায়ে গুঁপো, অত পারব নি। তা ছাড়া আপনারাই যখন রইছেন, আমার আবার যাবার দরকারটা কি? বাড়িতে মেলা কাজও জমে রয়েছে।

কথা শেষ হবার আগেই শঙ্কর রওনা দিল। লাবণ্যদিও খুশি হয়ে বললেন, দেখলে তো? ও ধমকধামকে কিছু লাভ হয় না, প্যাঁচ কষতে হয়।

তারপর আর কি! সবাই খেলার মাঠ পার হয়ে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম।

যেই না ঢুকলাম অমনি চারদিক ছায়া-ছায়া ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নাকে কেমন একটা বুনো গাছপালার সোঁদা গন্ধ আসতে লাগল। অন্য আওয়াজ টাওয়াজ সব কোথায় মিলিয়ে গেল, কানে আসতে লাগল শুধু বনের নিজের হাজার রকম সরসর, খসখস, মটমট, ঝিরঝির, ঝরঝর শব্দ।

কারো মুখে বেশি কথা নেই। প্রত্যেকেরি কাঁধে ঝোলানো একটা থলি, তাতে খাবারদাবার, জলের বোতল, আইডিন, এই সব। সঙ্গে লতিকাদি, দেখতে লাবণ্যদির মতো সুন্দর না হলেও, দারুণ গায়ে জোর। শুনেছি একদিন রাতে ওঁর ঘরে চোর ঢুকেছিল, তাকে ছাতা দিয়ে এমনি পিটেছিলেন যে, চুরি তো সে করতে পারেই নি, উপরন্তু অন্য জায়গা থেকে আনা মেলা জিনিসপত্র ফেলে কোনোমতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

লতিকাদি আজ আবার সেই গল্প আমাদের বলে বললেন, ভাগ্যিস পালিয়েছিল ব্যাটা! নইলে সেদিন যা রেগে গেছলাম, একটা এস্পার-

ওস্পার না করে ছাড়তাম না। সম্ভবতঃ ওস্পার। মেয়েরা, তোমরাও ঐরকম করবে। এখন নাও তো, প্রত্যেকে শক্ত দেখে একটা করে গাছের গাল ভেঙ্গে নাও তো। দেখাই যাক না, চোরদেরি একদিন, কি আমাদেরি একদিন।

তাই না শুনে আমরাও আশে পাশের গাছ থেকে একটা করে নিচু ডাল ভেঙ্গে নিয়ে, পাতাটাতা ছাড়িয়ে দিব্যি লগুড় বানিয়ে নিয়ে চললুম। ভাগ্যিস গুপেটা কাছে ছিল না, নইলে এই নিয়েই আবার কি না জানি বলত! হাড়গোড় ছড়ানো জায়গাটাও দেখলুম। ও বের করাতে অপূর্বদার কোনো বাহাদুরি ছিল না, একেবারে পথের ওপর। কথাটা লাবণ্যদিকে না বলে পারলুম না।

জানেন লাবণ্যদি, ছেলেদের ইস্কুলের অপূর্বদা এই মুগির হাড় দেখে কি যে কাণ্ড লাগিয়েছেন, সে আর কি বলব!

লাবণ্যদি ভুরু তুলে বললেন, অপূর্বদাটি কোন্ জন?

বললুম, ঐ যে গুণ্ডা চেহারার গুঁফো লোকটা।

তাই শুনে মুখে রুমাল দিয়ে, লাবণ্যদি খুব খানিকটা হেসে নিলেন। সব সময় এত ভালো ব্যবহার করেন। আমরা আর রুমাল কোথায় পাই, মুখের ওপর হাত দিয়েই খুব হাসলাম।

হঠাৎ লতিকাদি ঠোঁটে আঙ্গুল চেপে বললেন, শ্—শ্—শ্। সাবধান! এই পথে খানিক আগেই অনেক লোক হেঁটে গেছে। ঐ দেখ ঘাস মাড়ানো, এখন পর্যন্ত সব শুয়ে শুয়ে রয়েছে, খাড়া হবারো সময় পায় নি। ও বাবা! ওটা কি!

সমস্ত জঙ্গল কাঁপিয়ে একটা বিকট গ্‌গ্‌ম্ ম্ ম্ করে আওয়াজ হল।

লাবণ্যদির পর্যন্ত মুখ সাদা হয়ে গেল। কিন্তু কি সাহস তাঁর! আমাদের বললেন, মেয়েরা, তোমরা আমার পেছন পেছন এসো। এ হয় বাঘ, নয় বন্দুক!

আমরা তখুনি লাইন বেঁধে, এর কাঁধে ও হাত রেখে একজনের পেছন একজন এগুতে লাগলাম। লতিকাদি সবার শেষে।

আবার গ্‌.গ্‌.ম্‌ ম্‌ ম্‌ করে আওয়াজ হল। লতিকাদি এক লাফে লাইনের শেষ থেকে মাঝখানে এসে ঢুকলেন। বললেন, শুনেছি সবার শেষেরটাকে সর্বদা বাঘ নেয়। আমায় নিলে, কে তোমাদের রক্ষা করবে?

মেয়েরা তখুনি ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় আমার চোখে পড়ল ঝোপের মধ্যে রামছাগলের পশ্চাদ্ভাগ।

ডালপালাতে শিং আটকে গেছে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়েও কিছুতেই ছাড়াতে পারছে না, তাই হ ম্‌ ম্‌, গ্‌ম্‌ম্‌ করে ডাক ছাড়ছে।

মহা মুশকিল। কেউ ছাগলের কাছে যেতে চায় না। তখন লাবণ্যদি নিজের থলি থেকে মস্ত কলা বের করে, ছাগলের সামনে একটু তফাতে মাটির ওপর রাখলেন।

তাই দেখে রামছাগল এমনি জোরে এক ঝাঁপ দিল যে নিমেষের মধ্যে শিং ছেড়ে কলা সাবাড়! কি অদ্ভুত বুদ্ধি লাবণ্যদির!

আরেকটু এগিয়েই দেখা গেল পথের মাঝখানে একটা পেণ্টেলুনের বোতাম পড়ে। লতিকাদি বললেন, পুলিশদের বোতাম। তারা এর বেশি আর এগোয় নি।

লাবণ্যদি বললেন, নাও, ওটাকে যত্ন করে তুলে রাখো, একটু আগেই পড়েছে, পরিষ্কার ঝকঝক করছে, একটু শিশির পর্যন্ত লেগে নেই। তাই তো! বোতামটাকে তুলে যত্ন করে আমার থলিতে রাখলুম। বড় গোয়েন্দারা কখনো ছোট জিনিসকে অবহেলা করেন না।

তবে এও সত্যি যে আমার বুকটা একটু ঢিপঢিপ করছিল। আর আমাদের ক্লাসের মঞ্জির কথা আর কি বলব। ন্যাকার একশেষ। তার ওপর ওরা ভারি বড়লোক, নিজেদের মোটর চেপে ইস্কুলে আসে বলে অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না।

কত ঢং। রোজ নতুন নতুন শাড়ি পরা চাই, কানের গয়না বদলানো চাই, জুতোই আছে চার পাঁচ জোড়া!

আবার নিজে সঙ্গে করে টিফিন আনে না, ঠাণ্ডা খাবার খেতে নাকি ওর গা ঘিন্ ঘিন্ করে—কথাটা কাদের ঠেস দিয়ে বলা হত সে আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকত না—ওর জন্যে রোজ একটা কোটপরা চাকর টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে লুচি, চপ, সন্দেশ—এই সব নিয়ে আসে, আর ও আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে খায়। ঠিক হয়েছে! আজ যাদুকে নিজের খাবার নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে, হাতে ডাণ্ডা নিয়ে, আমাদের সঙ্গে আসতে হয়েছে। তবু কিন্তু ন্যাকামির শেষ নেই!

উঃ। লতিকাদি! কি একটা আমার পায়ের ওপর দিয়ে সড়সড় করে চলে গেল যে!

আমি বললুম, ও কিছু না। সাপটাপ হবে বা।

আর যায় কোথা!

ওঁ বাঁবাঁ। ওঁ লাঁবণ্য দিঁ!

বলে এক লাফে লাবণ্যদির পাশে। সেখানে আবার মাটিতে পা পড়বামাত্র ওরে বাবারে বলে সে কি চেল্লানি!

কি জ্বালা। কি হল কি, তাই বল না!

বলবে কি! ঠ্যাং চেপে মাটিতে বসে পড়েছে! আমরা অবাক হয়ে দেখি পা দিয়ে রক্তের গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। আর পায়ের ঠিক সেই জায়গাটার মাঝখানে একটা শিরার ওপর বিঁধে রয়েছে লাল সবুজ পাথর বসানো একটা সোনার পিন!

আমাদের কারো মুখে কথা নেই। ভয়ে ভয়ে এদিক্ ওদিক্ তাকাতে লাগলুম।

লাবণ্যদি কিন্তু তখুনি ওর পা থেকে পিনটা টেনে বের করে ফেলে, জায়গাটাকে বোতলের জল দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে, আইডিন লাগিয়ে, নিজের রুমাল দিয়ে বেঁধে ফেলেছেন।

অথচ তার কিছু দরকার ছিল না। আমাকে বললে, আমার সঙ্গে ব্র্যাণ্ডেজ ছিল, বেশ বেঁধে দিতে পারতুম।

আর মঞ্জির সে কি ঢং!

ও লাবণ্যদি, আপনি আমার পায়ে হাত দিলেন! দিন দিন আপনার পায়ের ধুলো দিন, নইলে আমার পাপ হবে!

ছোঃ! সাধে কি নেপুটা মেয়েদের ঘেন্না করে!

চার

যাই হোক, মঞ্জির পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার পর আমরা সবাই লাবণ্যদিকে ঘিরে পিনটা দেখতে লাগলুম।

মোটেই পিন নয়, স্ক্রু-আঁটা একটা কানের ফুল; লাল সবুজ পাথর থেকে আলো ঠিকরোচ্ছে।

আমরা বলতে লাগলুম, ইস্, এরকম তো কখনো চোখে দেখিনি! অমনি মঞ্জিটা বলে উঠল, ও আর এমন কি! আমার ঠাকুমার অমন মেলা আছে। তাছাড়া হার আছে, বাজু আছে, রতনচূড় আছে, কানবালা আছে, বাউটি আছে—"

লাবণ্যদি কিছু না বললেও, লতিকাদি শেষটা বাধা দিয়ে বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, ঢের হয়েছে, তোমাদের বড়মানষির আর ফিরিস্তি দিতে হবে না!

আমিও আর থাকতে না পেরে বললুম, আমাদের বুড়ি ঝির-ও ওরকম অনেক আছে।

অমনি লতিকাদি ধমক দিয়ে বললেন, তুমিও এবার থামো দিকি নি।

এতদিন পরে তবু চোরাই মালের একটা চিহ্ন পাওয়া গেল। আর একটা যখন পাওয়া গেল, বাকি বেরুতে কতক্ষণ! এ-সব ব্যাটাছেলেদের কম্ম

নয়। আমার বাবাকে তো রোজ পাঞ্জাবির বোতাম খুঁজে দিতে হয়। অথচ তবু নেপুটার কি চাল!

সবাই বলতে লাগল, তা হলে অন্য জিনিসগুলোও কাছেই কোথাও লুকোনো আছে। এটা কি করে অসাবধানে পড়ে গেছে। ঐ তো সামনে ভূতের বাড়ি, ওখানে থাকাও কিছুই আশ্চর্য নয়।

বিরাট বাড়ি। আশে পাশে বিশাল বিশাল শিশুগাছ। তাদের ঝোলানো পাতার ভেতর দিয়ে বাতাস বইছে—আর শিরশির করে শব্দ তুলছে। এখানে এত ঘন বন যে গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে ভালো করে আলো আসে না, চারদিকটা সবুজ সবুজ, ভিজে ভিজে, গা ছমছম করে।

বাড়িটাও প্রকাণ্ড, সারি সারি জানলার বেশির ভাগ ভেঙ্গে ঝুলছে। দেয়ালে পুরু হয়ে শ্যাওলা জমে গেছে, ফাটলে ফোকরে বেশ বড় বড় বট অশ্বত্থ গাছ গজিয়ে গেছে।

সদর দরজাটা হাঁ করে খোলা।

লাবণ্যদি সাহস দিয়ে বললেন, এত ভয়ও পাও তোমরা? আরে, এসব জায়গা তো পুলিশেই একবার দেখে গেছে। ওদের যত কাণ্ড, দরজাটাকে বন্ধ করে দিয়ে যায় নি পর্যন্ত। এখন ঘরে ঘরে বাঘ শেয়ালে আস্তানা গাড়ুক।

লতিকাদি সবার পেছন থেকে বললেন, চল, চল, এত আস্তে কেন। ঘরের ভেতরেই না হয় আরাম করে বসে খাওয়া দাওয়া করা যাবে।

ঢুকে তো পড়লুম। খিদেও পেয়েছিল দারুণ। এঘর ওঘর করে খাবার জন্যে একটা ভালো জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি, কেউ কেউ খিড়কি পুকুরে গেছে হাত-পা ধুতে।

হঠাৎ হাঁউমাউ! এ আবার কি জ্বালা! কে নাকি বারান্দার জমানো ধুলোতে পায়ের ছাপ দেখেছে। এমন ভীতুও হয় মেয়েরা!

লতিকাদি হঠাৎ দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির কাছ থেকে সরে এসে বললেন, ওপরে লোক আছে।

আমরা তখুনি যে যাকে পারি জড়িয়ে ধরলুম। লাবণ্যদি বললেন, না, ওরকম করলে চলবে কেন? চল, ওপরে গিয়ে দেখে আসি। দেখতেই তো এসেছি।

গেলুম সবাই শেষ পর্যন্ত। ওপরটা একটু আবছা মতন, জানলা অনেক বন্ধ রয়েছে। দুটো একটা যা ভেঙ্গে ঝুলছে, তারি মধ্যে দিয়ে একটু একটু আলো আসছে।

যেখানেই যাই, খালি মনে হয় একটু আগেই সেখানে কেউ ছিল, এখুনি সরে গেছে। যেদিকে তাকাই খালি মনে হয় সেদিক থেকে কেউ আমাদের দেখছিল, এখুনি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

মাঝখানে একটা বড় ঘর, দু পাশে দু সারি খালি ঘর। তবু মনে হয় কেউ আমাদের আড়ালে রেখে রেখে, নিজে সরে থাকছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা ভয়েই আধমরা, কারো মুখে কথাটি নেই।

হঠাৎ তাদের সঙ্গে একেবারে সামনাসামনি দেখা। নেপু আর তার অপূর্বদা। রাগে আমার গা জ্বলে গেল। অপূর্বদার পেছনে নেপুটা নিজের প্যাণ্ট আঁকড়ে কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই বলল, এই, সেপটিপিন আছে?

কতকটা তাই শুনে, কতকটা ভয় কেটে যাওয়াতে, মেয়েরা সবাই একসঙ্গে হিহি হোহো করে হেসে উঠল। আমার কিন্তু একটু মায়া করতে লাগল। একটা বড় সেপটিপিন দিলুম ওকে।

ততক্ষণে অপূর্বদা লাবণ্যদিদিদের সঙ্গে আলাপ পাকিয়ে নিয়েছেন—চালাক তো কম নন—এখন শুনলুম সব একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার কথা হচ্ছে।

শেষ অবধি দু দলে মিলে, সারাদিন ধরে সারা বাড়িটাকে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল, কিচ্ছু পাওয়া গেল না। কানের ফুলের কথা ওদের বলতে লাবণ্যদি মানা করে দিয়েছিলেন।

সন্ধ্যে লাগবার আগেই বাড়ি ফেরা হল। বাড়ি এসে শোবার ঘরে

ঢুকেই, পকেট থেকে একটা জিনিস বের করে, পড়ার টেবিলের ওপর রেখে নেপু বললে, এই ছাখ্, তোদের লাবণ্যদিদির কেরামতি ছাখ্।

তাকিয়েই আমার পিলে চমকে গেল! টেবিলের ওপর আমাদের কুড়িয়ে পাওয়া সেই লাল সবুজ পাথর বসানো কানের ফুলটা জ্বলজ্বল করছে।

নেপুর হাত চেপে ধরে বললুম, বল শিগ্‌গির, কোথায় পেলি?

নেপু বললে, কেন, ভূতের বাড়িতে কুড়িয়ে পেয়ে অপূর্বদার ব্যাগে রেখেছিলাম। তারপর খেয়েদেয়ে তোমরা যখন হাত ধুতে গেলে, তোমাদের পেয়ারের দিদিমণিটির ব্যাগ সার্চ করতে গিয়ে দেখি, যা সন্দেহ করেছিলাম ঠিক তাই। কখন ওটি অপূর্বদার ব্যাগ থেকে সরিয়ে নিজের থলিতে লুকিয়েছেন। আমি আবার ওটি উদ্ধার করলাম।

আমার হাত কাঁপছিল। চেঁচিয়ে বললুম, নেপু থাম্!

বলে আমার থলি থেকে ঐ রকম আরেকটা কানের ফুল বের করে সেটার পাশে রাখলুম। টেবিলের ওপর ছুটিতে মিটমিট করতে লাগল।

নেপুর মুখটা বোয়াল মাছের মতো হাঁ হয়ে গেছে। অবাক্ হয়ে থেকে, শেষটা বললে, কোথায় পেলি রে?

বনের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। লাবণ্যদির থলিতে রেখেছিলুম। নিশ্চয় ওটি সরিয়েছিলেন। আমরা হাত ধুয়ে এলে পর, যখন তোরা হাত ধুতে গেলি, তখন অপূর্বদার ব্যাগ সার্চ করে আবার ওটি পেলুম। অপূর্বদা নিশ্চয় সরিয়েছিলেন।

খানিকটা চুপ থেকে আবার বললুম, অন্ততঃ তাইতো মনে ভেবেছিলুম। এর মধ্যে কখন যে আবার জগদীশদার পিসিমা এসে পেছনে দাঁড়িয়েছেন তা টের পাই নি! হঠাৎ শুনি, ওমা! কোথায় যাব গো? এত ছোট কিন্তু এত সাংঘাতিক কে জানত! আমরা বলি খাতায় লেখাচ্ছি আর বনবাদাড়ে হাতড়ে মরছি, ওদিকে চোরবাছাধনরা ঘরের মধ্যে! ও শ্যামাদাস,

ও হরিচরণ, ও বড়বৌমা, মেজবৌমা, কোথা গেলে সব, দেখসে, কাণ্ড দেখে যাও।

মা জ্যেঠিমা তখুনি দুড়দাড় করে ছুটে এলেন। পিসিমা কানের ফুল দুটোকে তুলে ধরে বারবার বলতে লাগলেন, ওমা, এই না আমার মানিক-জোর, এই না আমার হারানিধি!

তারপর হঠাৎ এক হাতে নেপুর কান চেপে ধরে গর্জন করে উঠলেন, বল্ হতভাগা, কৌটো কোথায় রেখেছিস? ভালো চাস্ তো বল! উঃ, দেখে মনে হয় গাল টিপলে দুধ বেরুবে, এদিকে ভেতরে ভেতরে কাল কেউটে!

কান ধরে ভীষণ এক নাড়া দিয়ে বললেন, দে শিগ্‌গির। নইলে আজ তোকে পুঁতেই ফেলব! এ সব গয়না পত্তরের জন্যে আমার পূজনীয় পিতৃদেব নরক ভুগছেন, তা জানিস্। ও কি আমি সহজে ছেড়ে দেব ভেবেছিস নাকি? বের কর বলছি—অ্যাঁক!

ইতিমধ্যে জ্যেঠিমা হঠাৎ ছুটে এসে পিসিমার পিঠে বিরাশী ওজনের এক কিল বসাতেই, যেই না পিসিমা চমকে গিয়ে নেপুর কান ছেড়ে দিয়েছেন, অমনি নিমেষের মধ্যে সে তো হাওয়া!

আমি মাঝখানে পড়ে বারবার বলতে লাগলুম, ও জ্যেঠিমা, ও পিসিমা, আমার কথা শোনই না, নেপু ওগুলো নেয় নি, আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি!

কিন্তু কে কার কথা শোনে! জগদীশদা বোধ করি পিসিমার সঙ্গেই এসেছিল, ব্যাপার দেখে কেমন ঘাবড়ে গিয়ে এতক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারছিল না। এবার ঢোক গিলে বললে, আঃ, পিসিমা! তুমি তো আচ্ছা ফ্যাসাদ বাধালে দেখছি! গুটে থেকে নেপু পর্যন্ত সবাইকে সন্দেহ করলে কি করে চলে!

কি কষ্টেই যে শেষ অবধি পিসিমাকে ঠাণ্ডা করা হল সে আর কি বলব। নেপু সেই যে কেটে পড়ল আর তার দেখা নেই। শেষ পর্যন্ত আমাকে

সারা দিনের সব ঘটনা খুলে বলতে হল। মা পিসিমার হাতে কতকগুলো কচি কচি মটরশাকের গোছা গুঁজে দিতে দিতে বললেন, কি কি তোমার হারিয়েছে দিদি, বুঝলাম না। এই শুনি কৌটো গেছে, আবার এখন বলছ সোনার গয়নাও গেছে! কি জানি!

পিসিমা মাথার ঘোমটা ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, তবে কি আমি মিছে কথা বলছি নাকি, মেজবৌ? যার কৌটো গেছে তার কি গয়না যেতে নেই?

বলেই পিসিমার এমনি বুক ধড়ফড় শুরু হয়ে গেল যে তাঁকে ধরাধরি করে শোয়ানো হল আর শঙ্কর ছুটে গিয়ে ওঁদের বাড়ি থেকে গুরুদেবের চরণামৃত এনে দিল তবে না রক্ষে।

পাঁচ

সেকালে বড় দিনের বারো দিন করে ছুটি থাকত। একে একে তার প্রায় সবগুলিই কেটে গেল। সে যে কি ভীষণ শীত সে আর বলা যায় না। দূরে দূরে পাহাড়ের মাথায় সাদা সাদা বরফ জমে থাকতে লাগল। ঘুম থেকে উঠে রোজ দেখতুম হিম জমে বরফ হয়ে গিয়ে চারদিক সাদায় সাদা। ছোট ছোট পাহাড়ে নদীগুলোর ওপর এক পরত বরফ খুদে খুদে ঢেউসুদ্ধ জমে রয়েছে।

তারপর একটু রোদ উঠলেই সব বরফ গলে যেত। তখন শুধু ডালপালা থেকে টুপটাপ জল পড়ত।

অন্য বছর এ সময় অনেকেই পাহাড় থেকে নেমে যেতেন। চারদিক নিঝুম হয়ে যেত। আমরা ক' ঘর বারো মেসে বাসিন্দারা এখানে ওখানে টিমটিম করে বেড়াতুম। বিকেল হতে না হতেই সন্ধ্যে নেমে যেত, শীতের চোটে সবাই গিয়ে ঘরে উঠতুম।

এ বছর কিন্তু সবই আলাদা রকমের হল। শহর ছেড়ে যেতে কাকেও অনুমতি দেওয়া হল না, পাছে সেই সঙ্গে চোরাই মালও পাচার হয়ে যায়।

গাছের পাতা সব লাল হলুদ রঙ ধরে শেষটা খসে পড়ে গেছে। সবাই ছোট ছোট গোল গোল লোহার আংটা কিনে তাতে কাঠ কয়লা জ্বেলে, সকাল সন্ধ্যে হাত-পা সেঁকে আরাম করতে চায়।

এ বছর আমাদের স্কুলের বোর্ডিং থেকে কেউ যাবার অনুমতি পায় নি। বাৎসরিক পরীক্ষাও হয়ে গেছে, নতুন বছরের পড়া শুরু হয় নি, কাজেই সবার হাতে দেদার অবসর। সেই সুযোগে এবার একটু আগে আগেই ইস্কুলের জন্মদিন করা হল।

খুব কষ্ট হল, শহরসুদ্ধ সকলের প্রায় নেমন্তন্ন হল, মেলা চাঁদা তোলা হল। বাইরে বড় ঠাণ্ডা, সেখানে কানাৎ ফেলে উৎসব করলে সকলে শীতে কষ্ট পাবে। তাই আমাদের মস্ত হল্ ঘরের স্টেজে "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" অভিনয় হল।

হলের ও-পাশ দিয়ে একটা সরু লম্বা ঢাকা বারান্দা। তার অন্য মাথায় সাজের ঘর। দামী দামী কাপড়-চোপড়ে ঠেসে রয়েছে।

সেকালে ওখানে আর পোশাক ভাড়া করার ব্যবস্থা ছিল না, তাছাড়া ভাড়া-করা পোশাক কেউ পরতও না। কাজেই যে যার বাড়ি থেকে ভালো ভালো সব গরদ, মাদ্রাজী, বেনারসি এনেছিল। অবিশ্যি গয়নাগাঁটি সব পেতলের আর কাঁচের। বাবা! ইন্দুদির ক্লাশের সেই ব্যাপারের পর থেকে কার বাড়ির লোকেরা আর মেয়েদের হাতে গয়না দেবে!

মঞ্জিরা কেউ কেউ বড়মানষি দেখিয়ে জড়োয়া গয়না আনতে চেয়েছিল, কিন্তু ইন্দুদি তাই নিয়ে খুব রাগারাগি করাতে আর আনে নি।

সারাদিন ধরে ধুমধাম চলল। বেলা এগারোটা থেকে খেলাধুলো। বিকেলে বাগানে বক্তৃতা। লাবণ্যদি একটা সাদা রেশমি শাড়ি পরে ইস্কুলের জীবনী পাঠ করলেন। পরীর মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল। তারপর চা, মিষ্টি,

কমলালেবু খাওয়া হল। তখনকার দিনে জিনিস-পত্র সস্তা ছিল। পয়সা পয়সা করে এই বড় বড় কমলালেবু পাওয়া যেত।

নেপুদের দলও গেছল। ওদের অপূর্বদা দেখলুম সেজেগুজে এসে, গোঁফ নেড়ে নেড়ে লাবণ্যদির সঙ্গে ভারি ভদ্রতা করে এলেন। দেখেই আমার গা জ্বলে গেল। কানের ফুলের কথা এতদিনে পুলিশে ডাইরি পর্যন্ত হয়ে গেছে, তবু লজ্জা নেই। উল্টো ওঁর দলের লোকেরা, অর্থাৎ নেপু ইত্যাদি বলে কি না, মেয়ে নইলে এত বোকা হয় কখনো, যে চুরি করবে এক জোড়া কানের ফুল, তার আবার একটা ছুটো কোথায় পড়ে যাবে। আবার এসেছেন আমাদের ইস্কুলেই মুখ দেখাতে!

অভিনয় যেই না শুরু হবার সময় কাছে এল, অমনি যে যেখানে ছিল সব হুড়মুড় করে গিয়ে জায়গা দখল করল। যারা জায়গা পেল না, তারা দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি দাঁড়িয়ে পড়ল।

সকলের পরণে গরম জামা থেকে কেমন একটা ভিজে কম্বলের মতো গন্ধ বেরুতে লাগল। ভিড় আরো বেশী হত, কিন্তু প্রত্যেক বাড়িতেই দু এক জনকে থেকে যেতে হয়েছে, পাহারা দেবার জন্যে।

সে যাই হোক গে, বিকেল থেকেই সাজঘরে মহা হৈচৈ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু যেই না অভিনয় আরম্ভ হবে, আমাদের গানের ওস্তাদ সেতারে একটু টুং-টাং শব্দ তুলেছেন, অমনি সব ফাঁকা হয়ে গেল!

সবাই দৌড়ল রঙ্গমঞ্চের দিকে। উইংসের আড়াল থেকে, এদিক্ ওদিক্ থেকে কেউ স্টেজ দেখছে, কেউ ভিড় দেখছে।

সাজঘরে রইলেন আমাদের বোর্ডিংএর বড় মাসিমা। ওঁর অভিনয় দেখাবার এতটুকু আগ্রহ নেই। বলেন, কলকাতার বড় বড় থিয়েটারে কত নামকরা অভিনেত্রীদের দেখে এসেছেন, এখন আবার এসব কি দেখবেন!

দিব্যি বড় একটা আরামকেদারায় বসে, মোড়ার ওপর পা দুটি উঠিয়ে, নাকের ওপর চশমা লাগিয়ে, নাতনীর জন্যে ক্রুশ দিয়ে লেস বুনতে লেগে

গেলেন। ওদিকে কি হচ্ছে সে দেখবার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই, মুখে গোটা দুই পান পুরে একমনে বুনছেন।

মিনিট দশেকও যায় নি, হঠাৎ মনে হল কে তাঁকে একদৃষ্টে দেখছে। চমকে যেই না মুখ তুলেছেন, অমনি টুপ করে ঘরের আলো নিভে গেছে।

চ্যাঁচাবার জন্যে হাঁ করেছেন, অমনি কে একটা নতুন গামছা মুখের মধ্যে ঠুসে দিয়ে, মাথার চারদিকে দুবার ঘুরিয়ে চেয়ারের পেছন দিকের সঙ্গে জড়িয়ে বেঁধে দিয়েছে।

বড় মাসিমার হাত-পা তো পেটের ভেতর সেঁদিয়েছে!

পরে সবাই মিলে জেরা করাতে বেরুল যে কেউ তাঁকে মারে নি, ছোঁয় নি। শুধু ভাল করে মুখ বেঁধে দিয়েছিল। পরে কে যেন গিঁটের ওপর একটু হাত দিতেই খসে পড়েছিল।

কিন্তু সে সময় বড় মাসিমার মনে হয়েছিল দারুণ ষণ্ডা একটা লোক হাতে নিশ্চয় ঘন লোম, আর ওসবের লোকের সঙ্গে যে দুদিকে ধার দেওয়া বেঁটে ছুরি নেই, তাই বা কে বললে!

মনে হয়েছিল সে একাও নয়, সঙ্গে হাল্কা ওজনের কে একটা ঘরময় ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হয়তো একটি ছোট ছেলে। ডাকাতদের দলে নাকি ওরকম থাকে একটা, তার কোমরে দড়ি বেঁধে, ফোকর-ফাটল দিয়ে ভেতরে গলিয়ে দেওয়া হয়, আর তারাও নিঃশব্দে গেরস্তর যথাসর্বস্ব পাচার করে দেয়।

লোকগুলো নাকি বড় জোর ঘরে মিনিট পাঁচেক ছিল। তারি মধ্যে সব চেঁছেপুঁছে নিয়ে গেছে। একটু বাদেই মেয়েরা ড্রেস্ চেঞ্জ করতে এসে, বড় মাসিমাকে ঐ অবস্থায় দেখে যত না অবাক হল, কাপড়-চোপড় সব লোপাট হয়ে গেছে দেখে হাঁউমাউ করল তার চেয়ে বেশি!

আমার বন্ধু অমু সেজেছিল লক্ষ্মী। ভাগ্যিস প্রথম থেকেই তার মার বিয়ের বেনারসিখানা পরা ছিল, নইলে সেটিও যেত! আর আমরা ছিলুম

কিনিবিনির দলে, অত পোশাক-আশাকের দরকারই ছিল না আমাদের; ক্ষিরি যখন ঝি তখন আমার ছেঁড়া চাদর জড়িয়ে; আর ক্ষিরি যখন রানী, তখন চাদর খুলে লাল-নীল ঢাকাই কাপড়ে। কাজেই গেলুম বেঁচে।

কিন্তু মঞ্জি হয়েছিল ক্ষিরি। ওর বাবা সবচেয়ে বেশি চাঁদা দিয়েছিলেন, কাজেই আর কাকেও ক্ষিরি সাজানো যায় না। ওকে বারে বারে ড্রেস্ চেঞ্জ করতে হবে। পাছে কোনো গোলমাল হয়, তাই বোর্ডিং থেকে আলনা আনিয়ে, তাতে থাকে থাকে শাড়ি-জামা সাজিয়ে রেখেছিল। সে সব হাওয়া!

মঞ্জির বাড়িসুদ্ধ সকলের সে কি চ্যাঁচামেচি!

পুলিশ এল। এসেই জগদীশদার পিসিমার কথায় গুটেকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু সেও যে কোথায় গিয়ে গা ঢাকা দিল, তার আর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না।

সব চেয়ে দুঃখিত হলেন লাবণ্যদি। গেটের কাছে কাঁদো-কাঁদো মুখে বলতে লাগলেন, সবই আমার বুদ্ধির দোষে হয়েছে। সাজঘরের কাছে আরো লোক রাখা উচিত ছিল।

সবাই মিলে তখন তাঁকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

হল না অভিনয়, যে যার বাড়ি ফিরে গেল কিন্তু সে রাত্রে ঘুমোয় কার সাধ্যি। পুলিশের খাতায় সেবার নাম উঠেছে, বাড়ি বাড়ি সার্চ হচ্ছে।

জগদীশদাদের বাড়ি যখন গেছে, পিসিমা তাদের বেশ দু কথা শুনিয়ে দিয়েছেন।

আসল চোরকে ধরবার নামটি নেই। আবার প্যাণ্ট পরে বেল্ট এঁটে ভদ্দর লোকের বাড়ি গিয়ে গভীর রাতে হানা দাও ইত্যাদি!

জগদীশদা তো ভয়েই মরে, এই বুঝি পিসিমাকে ধরে নিয়ে যায়।

পরদিন বিকেলে বোর্ডিংএর বড় মাসিমা আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। জ্যেঠিমার সঙ্গে ভারি ভাব। এসেই বললেন, দিদি, মনে যে কি দারুণ

অশান্তি নিয়ে বেড়াচ্ছি সে আর কি বলব ! সব কথা তো কাউকে বলি নি। ঐ লোকগুলো খুব মন্দ নয়। যাবার সময় আমার কোলে এই দশটা টাকা ফেলে দিয়ে গেছল। গরীব মানুষ, হাতছাড়া করতে ইচ্ছে করছে না। নাতনীটার তো বিয়ে দিতে হবে।

এই বলে জ্যেঠিমার সামনে দশটা টাকা রাখলেন। সাধারণ টাকা নয়, যদিও সেকালের টাকা এমন কিছু খারাপ ছিল না, রুপো দিয়ে তৈরি, বেশ ভারীই ছিল। এগুলো তার চাইতে অনেক বড়, খুব পুরোনো, কালো হয়ে যাওয়া, ওপরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছাপ-মারা।

জ্যেঠিমা অবাক্ হয়ে বললেন, আরে, এ তো যে-সে টাকা নয়। এ নিশ্চয় কারো জমানো টাকা হবে। এ সব তো আজকাল চলবে না। ওরা এ কোথায় পেল ?

চলবে না শুনে বড়মাসিমার মুখ ফ্যাকাশে।

মা বললেন, বাজারে না চললেও, ব্যাঙ্কেট্যাঙ্কে দিলে হয় তো এক টাকার জায়গায় পাঁচ টাকাই পাওয়া যাবে। এ সব জিনিসের অনেক দাম। কোথায় পেল আমিও তাই ভাবি।

জগদীশদার পিসিমাও এসেছিলেন সেদিন, ঝুড়ি ঝুড়ি নালিশ নিয়ে। এতক্ষণ হাঁ হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ বলা কওয়া নেই, লাফিয়ে উঠে, ঝড়ের মতো বেরিয়ে, সোজা বাড়ির পথ ধরলেন।

পিসিমা চলে যেতেই, গোল-গোল চোখ করে বড় মাসিমা জ্যেঠিমাকে বললেন, তা দিদি ওনাকে আপনারা নিজের লোক মনে করতে পারেন। কিন্তু উনিও কিছু কম যান না। বলুন তো, অত সোনাদানা পেলেন কোথায় যে আজ কৌটো হারায়, কাল কানের ফুল হারায় ? বাবার দেওয়া না হাতী ! সে বুড়োকে আমার বেশ মনে আছে। আট হাত কাপড় পরে সারা শীতকাল কাটিয়ে দিত, নিরামিষ খেত, গয়লাকে পয়সা দিত না। ওর ঘরে অত সোনাদানা কেমন করে আসবে গা ?

মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, না না, উনি বোধ হয় খুব কিপ্‌টে ছিলেন। গয়নাগাঁটি তুলে রাখতেন, খরচ-পত্র করতেন না।

বড়মাসিমা তবু বলতে লাগলেন, বুড়ো চোখ বুঁজলে পর কাউকে ভালো করে ফলার করাল না পর্যন্ত। কোত্থেকে ঐ জগদীশটাকে আনাল, শুনি নাকি ওর ভাইপো। কি জানি বাছা কে যে চোর আর কে যে সাধু বুঝিনে।

মা আরো ব্যস্ত হলেন, দেখুন ওঁরা সত্যি ভালো লোক। কেবল যখন সাজঘরে অমন কাণ্ড হচ্ছিল, আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম জগদীশ আর তার পিসিমা, আমার সামনে বসে জায়গা নিয়ে মহা খ্যাচাখেচি করছে! বিশ্বাস করুন ওঁরা এর মধ্যে নেই।

বড়মাসিমা উঠে বলেন, যাই, আমার আবার সন্ধ্যেবেলায় ডিউটি আছে।

দরজা অবধি গিয়ে আবার ফিরে এলেন।

ভাই, এই সন্ধ্যেবেলায় এখন আমার একাটি একাটি টাকাগুলো নিয়ে যেতে ভয় করছে, তুমি বরং রেখে দাও।

মা যেন ঘাবড়াচ্ছেন দেখে, আমি বড়মাসিমার হাত থেকে টাকাগুলো নিয়ে আমার বইয়ের তাকে, বইয়ের পেছনে গুঁজে রেখে দিলুম।

বড়মাসিমা খুশি হয়ে বাড়ি চলে গেলেন।

ছয়

এসব এতদিন আগের কথা যে ঘটনাগুলো কোনটা আগে কোনটা পরে ঠিক ঠিক মনে নেই, তবে ঐ একটা গোটা বছর আমার জীবনে আর সব বছর থেকে একেবারে আলাদা, এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।

মনে আছে সে বছরটা খাওয়াদাওয়া বেড়ানো-বুড়োনো এসব নিয়ে কেউ

মাথা ঘামাত না। সকলের মুখে সর্বদা ঐ এক কথা, কে জানলায় লোহার সিক বসালে, কে লোহার সিন্দুক কিনল, সেটা কোথায় রাখা হল, কার গয়নাগাঁটি ব্যাঙ্কে জমা হল, কে সে-সব সেখানে পৌঁছে দিল—এই সব।

নেপু বলত, বাঃ, চোরদের তো ভারি সুবিধে হয়ে গেছে, একটু কানখাড়া করে থাকলেই হল, সব খবর পেয়ে যাবে। কার কার কুকুর আছে, তাদের মধ্যে কারা কামড়ায়? কার ঘরে বন্দুক আছে, কে কে সে-সব ছুঁড়তে জানে—কিছুই কারো জানতে বাকি থাকল না।

ঐ ঘটনার পর যেই পিসিমা সন্ধ্যেবেলায় আলোয়ান মুড়ি দিয়ে আমাদের বারান্দায় উঠেছেন, মা আর জ্যেঠিমা ওঁকে জেরা করতে লেগে গেলেন। ততক্ষণে পিসিমারো রাগ পড়ে গেছে, অনেক কথার উত্তর দিলেন। সবাই সে সব শুনতে এমনি মেতে গেল যে, মাছওয়ালী বুড়ী এক চুবড়ি বিকেলে ধরা পাহাড়ে কইমাছ নিয়ে এসে ডেকে ডেকে, সাড়া না পেয়ে ফিরেই যাচ্ছিল। ভাগ্যিস আমি বুদ্ধি করে জ্যেঠামশাইকে বললুম, না হলে সেদিন মাছ খাওয়া হয়েছিল আর কি!

পিসিমারা তো গিয়ে জ্যেঠিমার শোবার ঘরে ঢুকলেন। আমিও একটু পরে সেখানে গিয়ে শুনি মা বলছেন, যাই বল ঠাকুরঝি, ঐ বুড়োর নাতি-নাতনীরা কে কোথায় আছে খোঁজ করা উচিত।

জ্যেঠিমা বললেন, আর তাই যদি হয় যে সোনার নস্যির কৌটো উদ্ধার করা ওদের উদ্দেশ্য, তবে সে তো হয়েই গেছে, তবু চুরি থামে না কেন?

পিসিমা জ্যেঠিমার খাটের ওপর পা গুটিয়ে বসে বললেন, তোরা কিছুই জানিস না নাকি? জুয়ো খেলায় আর চুরি করাতে, যতই সফল হওয়া যায় ততই নেশা লেগে যায়।

মারা চুপ করে থাকছেন দেখে আবার বললেন, তাহলে তোদের সত্যি কথাটাই খুলে বলি। তোরা যেন আবার পাঁচ কান করিস নে।

কৌটো না হয় চুরি গেছে কিন্তু তার ঢাকনিটা আছে তো? এই এত

বড় হীরের প্রজাপতি বসানো ঢাকনিটাই তো আসল। সেটি তো আর ওরা পায় নি। আমার তো মনে হয় সেটি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে, এ আর কিছু নয়।

মা অবাক হয়ে বললেন, সেটি বুঝি ব্যাঙ্কে পাঠাও নি? পিসিমাকে যেন বিরক্ত মনে হল।

আরে তবে বলছি কি, খুঁজে পেলে তো পাঠাব। সে যে কোথায় রেখেছি সে আর কিছুতেই মনে করতে পাচ্ছি নে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, চোররা পাবে কি, আমিই পাচ্ছি না!

জ্যেঠিমা বললেন, এই যদি ব্যাপার হয় তো গুটেকে সন্দেহ করা কেন?

মা-ও আর থাকতে না পেরে আসল কথাটাই বলে বসলেন,

আর পরশু বোর্ডিং-এর মাসিমার টাকাগুলো দেখে অমন করে চলে গেলে কেন?

পিসিমা অমনি টুক করে খাট থেকে নেমে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললেন, ওমা, বাগানে এই শীতের মধ্যে ও আবার কিসের চারা গজিয়েছে রে? যাই, একবার দেখেই আসি।

এই বলে বাগান দেখার নাম করে সেখান থেকে দে পিট্টান।

জ্যেঠিমারা বোধ হয় খুব রেগে গেলেন, তাই এতক্ষণ কিছু বলেন নি, এবার হঠাৎ আমার দিকে ফিরে খুব ধমকধামক করতে লাগলেন, এইটুকু মেয়ে, তবু বড়দের কথা শোনা, হেন-তেন কত কি!

আরেকটু রাত হলে জগদীশদা এসে নিচু গলায় বললে, ও মামীমা, তোমরা কি একটা খুব ভালো চাকর রাখতে চাও? দশ টাকা মাইনে, দু বেলা পেট ভরে ভাত, দু বেলা চা জল-খাবার, বছরে চারখানি কাপড়, ব্যস্।

জ্যেঠিমা বললেন, ঠাকুর ছুটি চাইছে, লোক অবিশ্যি আমাদের সত্যি দরকার, কিন্তু অত চায় কেন?

জগদীশদা কপালে চোখ তুলে বললে, অত মানে কি? তার বদলে কি

পাচ্ছ জানো? সাক্ষাৎ একটি দ্রৌপদী! ওর রান্না যদি একবার খাও তো সারা জীবন হা-হুতোশ করে মরবে! চপ-কাটলেট রাঁধে তো দাঁতের মধ্যে কুরকুর করে ওঠে, আবার মুখে যেতেই মিলিয়ে যায়।

মাংস রাঁধে যেন ক্ষীর। আর পায়েস পিঠে বাঙালী হয়ে জন্মানোর দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। রাখো তো বল, গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ডেকে আনি। খুব ভালো লোক, খুব চেনা আমার।

জ্যেঠিমা বললেন,.তা রাখলে মন্দ হয় না, ঠাকুর তো পাস পার্মিট করিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে রয়েছে। তার দুমাস মানেই সাত মাস। তাই তাকে আন তো দেখি।

জগদীশদা এক দৌড়ে গিয়ে একমুখ দাড়ি গোঁফওয়ালা একটা লোককে ধরে নিয়ে এল।

আমার জ্যেঠিমা উঠে এসে লণ্ঠনটা তুলে ধরে মুখ দেখতে লাগলেন। চোখে আলো পড়াতে সে লোকটা চোখ পিটপিট করতে লাগল।

আমি অবাক হয়ে বললুম, ইয়ার্কি পেয়েছ জগদীশদা? এই তোমাদের সেই চোরের সর্দার গুটে না?

জ্যেঠিমা চমকে উঠে আরেকটু হলেই লণ্ঠনটা ফেলে দিচ্ছিলেন। জগদীশদা আমাকে এক ধমক, তুই থাম দিকি নি। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

গুটেও বিরক্ত হয়ে বলল, অত তেজ কিসের তোমার, দিদি? জানো আমি ম্যাট্রিক পাশ? গোয়েন্দাগিরির সার্টিফিকেট আছে আমার। ট্যাক্স দিই।

জ্যেঠিমা বাধা দিলেন, আচ্ছা আচ্ছা ঢের হয়েছে, করবে তো রাঁধুনিগিরি, তা অত সার্টিফিকেট দিয়ে কি হবে? দেখ, তোমাকে আমি রাখতে পারি ঐ মাইনেতে, কিন্তু তাহলে তুমি খালি মন দিয়ে রাঁধাবাড়া করবে। গোয়েন্দাগিরি যা করবার আমরা করব, আমাদের সার্টিফিকেট না থাকতে পারে, কিন্তু খাতায় নাম লেখা আছে।

বুঝলে বাবুরা বাজার করে দেবে, আমি দুবেলার ভাঁড়ার বের করে দেব, মেজবৌ কুটনো কুটে দেবে, আর তুমি কি রাঁধাবাড়া হবে সব নিজে ঠিক করে, মসলা বেটে, দুবেলা রাধবে, ব্যস্। তোমার পেছনে আমরা ম্যাও ধরে বেড়াতে পারব না বলে রাখলাম। এবার একটু তদন্ত করবার তা হলে ফুরসত পাব।

গুটে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, গোয়েন্দাগিরিটাই হল গিয়ে আমার পেশা, মা-ঠাকরুন, সেটাই ছেড়ে দিলে যে একেবারে রাঁধুনে বামুন বনে যাব।

জ্যেঠিমা আশ্চর্য হয়ে বললেন, মাইনে নিয়ে, দুবেলা পেটপূজো করে, লোকের বাড়ি রান্নার কাজ করবে আর রাঁধুনে বনবে না, সেটা কি করে হয় বাছা? আমার কথা ভালো না লাগে তো অন্য জায়গায় চেষ্টা করতে পার। তবে পুলিশে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেটা মনে রেখো।

গুটে একটু রেগে গেল, যা হয় একটা বললেই হল কিনা মা-ঠাকরুন! পিসিমার কথায় আমাকে যদি পুলিশে ধরে,তো ক্ষতি হবে কার?

গুটে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ততক্ষণে জগদীশদা গিয়ে বাবা আর জ্যাঠামশাইকে ধরে এনেছে। তাঁরাও চপ কাটলেট মুর্গ-মশল্লামের নাম শুনে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, গুটেকে রাখা হোক। জগদীশ ওকে কদিন খাটের তলায় লুকিয়ে রাখতে পারে? না হে গুটে, তুমি এখন থেকেই কাজে বহাল হলে। বাপ! পনরো বচ্ছর ধরে রোজ দুবেলা শাক-চচ্চড়ি আর মাছের ঝোল খেয়ে খেয়ে খাওয়ায় ঘেন্না ধরে গেছে না! তা, কাল সকালে কি রাঁধছ বল!

এই নিয়ে মহা একটা সোরগোল হয়েছিল। শেষ অবধি জ্যাঠামশাই বললেন যে, আমাদের বাড়ির মধ্যে গুটে গোয়েন্দাগিরি করবে না। কিন্তু রোজ সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার মধ্যে রাঁধাবাড়া সেরে ঢাকাঢুকি দিয়ে চলে যাবে। আবার সাড়ে দশটায় জ্যাঠামশাই শুতে যান, তার মধ্যে ফিরে

আসা চাই। তাই শুনে গুটে মহা ক্যাঁওম্যাও লাগল, ও বাবা! রাতে আমি বেরুতে পারব না, আমার ভূতের ভয় করে!

জ্যেঠিমা দারুণ চটে গেলেন, নবাব! চাকরের কাজ করবেন, তার আবার ভূতের ভয়! ওসব বড়মানুষি এখানে চলবে না বলে রাখলুম!

কিন্তু যে যাই বলুক মুর্গ-মশল্লামের কথা শুনে অবধি, বাবা জ্যাঠামশাই গুটেকে ছাড়তে রাজী নন। বাবা বললেন, বেশ, তা হলে রোজ বেলা এগারোটার মধ্যে রান্না সেরে বেরিয়ে যাবে, চারটের সময় ফিরে এসে চায়ের জল চাপাবে।

বলেই বাবা একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, হ্যাঁরে, দিনে বেরুলে তোকে পুলিশে ধরবে না?

গুটে সলজ্জ হেসে বললে, না স্যার, আমি লেডি সেজে থাকব। এর মধ্যে দুদিন ওরকম সেজে ইন্সপেক্টর বাবুর বাড়ি গিয়ে লেবু বেচে ওনাদের পরখ করে এসেছি। তবে আপনারা কিন্তু আমাকে শশীকলা বলে ডাকবেন। তাতে কোন দোষ হবে না। শশীকলা হল গিয়ে আমার স্ত্রীর নাম, সে দেশে থাকে, জানতেও পারবে না। আপনাদের কোনো ভয় নেই, কাল সকালের মধ্যে দাড়ি চেঁচে শাড়ি পরে কেমন কাজে লেগে যাই দেখবেন।

যাবার আগে জগদীশদা বাবাকে বলল, দেখবেন মামা, ওটি একটি রত্ন। আপনার ঠাকুর ফিরে এলেও ওকে আপনার ছাড়তে ইচ্ছে করবে না। তখন কিন্তু আমার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে বলে রাখলাম। ততদিনে আশা করছি এদিককার গোলযোগ চুকেবুকে যাবে।

গুটে কিন্তু খুব আপত্তি করতে লাগল, ও আবার কি কথা, স্যার? গোলযোগ চুকে গেলেও আমাকে এ রকম চাকরি করতে হবে নাকি? আমি হলাম গিয়ে গোয়েন্দা, অন্য কোথাও তদন্ত করতে চলে যাব।

জগদীশদা বিরক্ত হয়ে বললে, রাখো! তোমার তদন্তের চাইতে তোমার রান্না শতগুণে ভালো।

তারপর বাবাকে বললে, মামা, বড় উপকার করলেন, তার পুরস্কার হাতে হাতে ঐ গুটের হাতেই পেয়ে যাবেন রোজ দুবেলা !

সাত

এমনি করে শশীকলাদিদি আমাদের বাড়ীতে এসে জুটলেন। মা-বাবা, জ্যাঠামশাই, জ্যেঠিমা, জগদীশদাদা আর আমি ছাড়া কেউ আসল ব্যাপারটা জানল না, নেপুও না। ওকে বলা মানেই অপূর্বদাকে বলা, তার মানেই খবরের কাগজে ছেপে দেওয়া।

তবে একথা সত্যি শশীকলাদিদি খাসা রাঁধে। প্রথম দিনটা মা জ্যেঠিমা একটু খেঁইমেই করেছিলেন, বড্ড ঘি খরচ করে, ওঁরা রান্নাঘরে গেলে তেড়িয়া হয়ে ওঠে ইত্যাদি ! কিন্তু একবার রান্না খেয়ে আর টুঁ শব্দটি করলেন না। একমনে এর ওর বাক্স সার্চ করতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল। আমাদের সকলের ইস্কুল-টিস্কুল কবে খুলে গেল, নতুন বছরের পড়াশুনো শুরু হয়ে গেল, গোছা গোছা সব নতুন বই খাতা এল। কি সুন্দর যে তাদের গন্ধ, নাক লাগিয়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করত।

নেপু দিস্তে দিস্তে হলদে কাগজ কিনে এনে, এক ভাঁড় ময়দার লেই বানিয়ে খাতার মলাট দিতে লেগে গেল। অথচ পড়াশুনো করবে কচু !

চুরিটুরি গুলোও কমতে কমতে একরকম বন্ধই হয়ে গেল। যাদের ধরা হয়েছিল, তাদের অনেকের বিরুদ্ধেই কোনোরকম প্রমাণ না পাওয়াতে বেশীর ভাগই ছাড়া পেয়ে গেল। দেখলুম দিব্যি চেকনাই শরীর করে সব দলে দলে বেরিয়ে এলেন।

বিকেলে জগদীশদার পিসিমা আমাদের বাড়িতে এলেন।

ছাখ দিকিনি কাণ্ডটা ! গুরুদেব সেখান থেকে আধখানা হয়ে এলেন,

তবু তাঁর কাছে সব কথা খুলেই বলে ফেললাম। শুনে বললেন, কৌটো গেছে আবার পাওয়া যাবে, কিন্তু হীরের প্রজাপতি দেয়া ঢাকনিটে হাতছাড়া করার কোনো মানেই হয় না, ওটি ওঁর চরণে জিম্মা করে দিলে আর কারো বাবার সাধ্যি থাকবে না খুঁজে বের করে।

কিন্তু সে যে কোথায় লুকিয়ে রেখেছি কিছুতেই মনে করতে পাচ্ছিনে। গোটা বাড়িটাকে ওলটপালট করে ফেললাম, তবু পেলাম না! কি করা যায় বল দিকি নি? ওটি এখন চুরি গেলেও তো টের পাব না! গুটেকে কেন যে তাড়ালাম! সে থাকলে ছোঁকছোঁক করে ঠিক বের করে দিত!

মা জ্যেঠিমা এ ওর মুখের দিকে তাকালেন, মা একটু আমতা আমতা করে অন্য কথা পাড়লেন, আচ্ছা, ঠাকুরঝি, সেদিন মাসিমার হাতে পুরোনো টাকা দেখে অমন করে ছুটে চলে গেলে কেন, সে তো বললে না?

পিসিমা দু' চোখ কপালে তুলে বললেন, ওমা বলি নি বুঝি? ভাখ, দিকি কাণ্ড। তবে শোন্, আমার বাবা চোখ বুজলে, শ্রাদ্ধশান্তির আগের দিন, ওঁর খাটের তলা থেকে বিরাট এক লোহার ট্রাঙ্ক বেরুল, এমন ভারী যে একা আমি সহজে নাড়াতে পারি নে!

একদম কানায় কানায় এই বড় বড় ভারী ভারী রুপোর টাকায় ঠাসা, একেবারে অবিকল বোর্ডিং-এর মাসিমার ঐ টাকার মতন! তখন আর সময় ছিল না, কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে এক মুঠো তুলে ভালো করে দেখবার জন্যে আঁচলে বেঁধে ফেলে বাকি আবার বন্ধ করে ফেললাম। সে কি বন্ধ হয়! বাক্সের ডালায় চেপে বসে তবে বন্ধ করতে হল! অথচ শ্রাদ্ধশান্তির পর ডালা খুলে দেখা গেল কেবল ছেঁড়া কাগজ আর পুরোনো বই দিয়ে ঠাসা!

জ্যেঠিমা বললেন, ওমা! অত সব নিলে কে?

পিসিমা প্রায় কেঁদেই ফেলেন, কে নিল বুঝবে কে? এমন কি যখন

টাকার কথা বললাম কেউ বিশ্বাসই করে না। বলে হ্যাঁ, এর বাড়ি ওর বাড়ি খেয়ে বেড়াত, ওর আবার অত টাকা আসবে কোত্থেকে?

পিসিমা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। মা বললেন, তারপর মাসিমার হাতে ও টাকা দেখে বুঝি ভাবলে যে তোমার গুলোই কেউ সরিয়েছে? বাড়ি গিয়ে কি দেখলে?

পিসিমা বললেন, দেখলাম আমার পঁচিশটে টাকা ঠিকই আছে। অথচ এগুলোও সেই রকমই দেখতে বটে! কি জানি, কত কি মনে হচ্ছে!

শশীকলাদিদি এতক্ষণ দোরগোড়া থেকে সব শুনছিল, কেউ টের পায় নি। এবার একটা ছোট নোটবই আর কপিং পেন্সিল বের করে বলে উঠল, আচ্ছা, আপনার বাবা মারা যাবার সময় বাড়িতে কে কে ছিল?

পিসিমা বললেন, তোমার তাতে কি, বাছা? তবে বলতে কোনো বাধা নেই, বাড়িতে ছিল না বিশেষ কেউ, বুড়ো কি আর কাকেও চটাতে বাকি রেখেছিল! ছিলাম আমি, আর জগদীশের বাবা ঘেঁটু আর আমার অধরদা, তার মেয়ে রেবতী আর আমাদের চাকর রামভজন। তাদের কাকেও সন্দেহ করা যায় না, পুরোনো লোক, নিকট আত্মীয়, বিশ পঁচিশ বছরের সব জানা। তাছাড়া তাদের বাক্স প্যাঁটরা খুলিয়ে নিজে দেখেছিলাম, তাইতেই তো সকলের সঙ্গে চিরকালের ছাড়াছাড়ি!—ও কি শশীকলা, আমার সব কথা টুকে রাখছ কেন? না মেজবৌ, বড়বৌ, এ আমি ভালো বুঝিনে!

শশীকলাদিদি লজ্জা পেয়ে বললে, না, মানে, বাবু আমাদের সবাকার নাম লিখিয়েছেন কিনা, তাই সময় পেলেই একটু চেষ্টাচরিত্তির করি।

জ্যেঠিমা শুকনো গলায় বললেন, সময় কোথায় পেলে বাছা?

শশীকলা দিদি আর দাঁড়াল না।

পিসিমা চলে গেলে পর জ্যেঠিমা রান্নাঘরে গিয়ে শশীকলাদিদিকে আচ্ছা করে বকে দিলেন।

মেয়েমানুষের অত কি বাপু ? বলেছি না টিকটিকির কাজ আমরা করব, তুমি রাঁধাবাড়া নিয়ে থাকবে। বেলা এগারোটা থেকে চারটে অবধি বাড়ির বাইরে তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো, তার ওপর আমাদের হাত নেই —কিন্তু এখন তুমি আমাদের রাঁধুনী—দাও শিগ্‌গির খাতা।

বলে খাতাখানা টেনে নেন আর কি ! শশীদিদিও কিছুতেই দেবে না, উল্টে মহা হাঁউমাউ লাগল ! তাই শুনে বাবা জ্যাঠামশাই ছুটে এলেন, আহা, কর কি, কর কি, এদ্দিন বাদে চাট্টি ভালোমন্দ খেয়ে বাঁচছি, তা তুমি দেখছি সব পণ্ড করে দেবে ! না, না, তোমার খাতা দিতে হবে না, এখন যাও দিকি নি রান্নাঘরের দিকে, আপ্‌গানি কাটলেট করবে বলেছিলে না ?

বাস্তবিক শশীকলাদিদির সে রান্নার স্বাদ আজো আমার মুখে লেগে রয়েছে। কাজেই নেপু, আমি, বড়দা ইত্যাদি সবাই ওর ওপর মহাখুশি ছিলাম।

সন্ধ্যেবেলা পড়ার ঘরে অঙ্ক কষছি, এমন সময় শশীকলাদি এসে হাজির !

ও দিদি, বলই না সে টাকা দেখেছিলে নাকি ?

আমি নেপুর দিকে তাকিয়ে বললুম, কোন্ টাকা ?

সে বললে—ঐ যে বুড়ো মলে পর বাক্স থেকে উধাও হল, তারপর বোর্ডিং-এর বড় মাসিমা ঠিক সেই রকম দেখতে টাকা তোমার কাছে রাখতে দিলেন ? দেখি না একবারটি।

নেপু রেগে গেল, আঃ শশীকলাদিদি, তুমি দেখছি আমাকে কাল বকুনি খাওয়াবে। এমনিতেই অঙ্ক হয় না !

সে চলে গেলে আমাকে জিগ্‌গেস করল, কোন্ টাকা রে ?

আমি বললুম, হ্যাঁ, সে আমি তোমায় বলি আর তুমি গিয়ে কাপ্তান অপূর্বর কাছে লাগাও আর কি !

নেপু অঙ্কটঙ্কর কথা ভুলে গেল।

অপূর্বদার বিষয় তুই কি জানিস শুনি? জানিস ইণ্টার-কলেজিয়েট সাঁতারের জন্যে উনি মেডেল পেয়েছিলেন? তা ছাড়া ভাগ্যিস ওঁর দল রাতে পাড়ায় পাড়ায় টহল দেয়, তাই চোরবাছাধনরা আর টুঁ শব্দটি করতে পারছেন না!

বললুম, রেখে দাও! ওঁর নাকের সামনে আমাদের ইস্কুলে অমন কাণ্ড হয়ে গেল, ভারি আমার ওস্তাদ রে!

নেপু তাই শুনে একটু মুচকি হেসে বললে, সে বিষয়ও কিছু এগোয় নি ভেবেছিস নাকি তোরা? শিগ্গির একদিন সব চোখ ট্যারা হয়ে যাবে দেখিস!

এমনি সময় শশীকলাদিদি দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলল, গরম গরম চপ ভেজেছি, খাবে নাকি দু একটা?

এর পর তো আর কোনো কথাই হতে পারে না।

ওসব ছোট জায়গায় সেকালে কারো ঘরের কথা কারো জানতে বাকি থাকত না। দুদিনেই একথা জানাজানি হয়ে গেল যে জগদীশদার সঙ্গে অপূর্বদার কিছু নিয়ে মন কষাকষি চলেছে।

সত্যি আগে দেখতুম দুজনায় ভারি ভাব, কিন্তু আজকাল দেখা হলেই আমাদের কাছে জগদীশদা অপূর্বদার খুব নিন্দেমান্দা করতে শুরু করল। প্রথমটা বেশ মজা লাগত।

পরে নেপুকে গিয়ে বলতুম আর সে তো রেগে টং!

ঐ স্টুপিডটাকে এ বাড়িতে আসতে দিস কেন রে? যার নিজের পকেট থেকে নিজেদের সোনার কৌটো চুরি যায়, অথচ নিজে টের পায় না, সে আবার একটা মানুষ নাকি? অপূর্বদার সঙ্গে ও ব্যাটার তুলনা! কিসে আর কিসে, সোনায় আর সীসেয়! কই অপূর্বদা তো জগদীশদার বিষয় কিছু বলতে আসেন না!

শশীকলাদিদি যে কখন এসে আমাদের পেছনে দাঁড়িয়েছে সে আমরা টের পাই নি। সে বললে, তা সে বলবে কেন ? একটা ধর্ম্ম আছে তো ? জগদীশবাবুর কাছে রাশি রাশি ঘুষ খেয়েছে না!

নেপু বললে, কি আবার ঘুষ খেয়েছে ?

শশীকলাদিদি জিভ কেটে বললে, না, না, ও কিছু না, বলে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল।

এবার আর মাসিমার ঐ টাকাগুলোর কথা নেপুকে না বলে পারলুম না। নেপু তো হাঁ!

কই, দেখা তো টাকাগুলো ?

আস্তে আস্তে বইয়ের তাকের কাছে গিয়ে দেখি তাক তোলপাড় করে কে খোঁজাখুঁজি করেছে!

নেপু বললে সর্বনাশ! তবে তো সেগুলোও গেছে! না হেসে পারলুম না। তাকের তলা থেকে আমার পুরোনো জুতোটা টেনে বের করে তার মধ্যে থেকে টাকা বের করে নেপুকে দেখালুম।

নেপু ওগুলোকে নেড়েচেড়ে বললে, এখন এর একেকটার দাম হয়তো পঁচিশ টাকা। সাধে মাসিমা কাছে রাখতে ভয় পান। দে আমাকে, অপূর্বদার কাছে রেখে দিই, কারো বাবাঠাকুর টেরটি পাবে না!

দিলুম না কিছুতেই।

ওদিকে জগদীশদাদের বাড়িতেও মহা গোলমাল। পিসিমার গুরুদেব কায়েমী হয়ে বসেছেন। এমনিতে পিসিমার মুখের ওপর কিছু বলতে জগদীশদা সাহস পায় না, এবার কিন্তু দারুণ একচোট ঝগড়া হয়ে গেল! জগদীশদা বললে, ছাখো, তোমার গুরুদেবকে এবার কাশীবাসী হতে বল, নইলে ভালো হবে না। একবার শ্রীঘর ঘুরে তো যথেষ্ট চেষ্টা হয়েছে, আবার এখানে কেন ? তাছাড়া সন্নিসি মানুষের অত কি রে বাবা! রোজ রোজ গাওয়া ঘি, খ্যাসরাপাতি চালের ভাত, ছানার বড়া! কই আমাকে

তো এর সিকির সিকিও দাও না। অথচ খালি খালি বল, টাকা দাও, টাকা দাও। বলি, তোমার গুরুদেবকে পুষবার জন্যে তো আর আমি আপিসে চাকরি করি না!

পিসিমাও রুখে উঠলেন, ওরে হতভাগা! গুরুদেব শিবের মাথায় বেলপাতা দিলেন, তবে না চাকরি পেলি! আবার বড়াই! যা আছে তোর সবি তো গুরুদেবের দয়াতে।

জগদীশদা বললে, ইস্, তা তো বটেই! এই বাড়ি আমার ঠাকুরদা দেন নি আমাকে? গয়নাগাঁটি, টাকাকড়ি সবই আমার হোত, তুমি যদি মাঝখান থেকে সেগুলো মেরে না দিতে! যাক গে, ওকে এখন ভালোয় ভালোয় কেটে পড়তে বল দিকি নি।

চ্যাঁচামেচি শুনে গুরুদেবও এসে হাজির! রাগের চোটে মুখের রং পাকা আম, চুলদাড়ি খাড়া। চেঁচিয়ে বললেন, তাই কেটিয়ে যাবে রে। তখন তোর কি অবস্থা হয় দেখিয়ে দেবো। দে বেটি, কৌটোর সে পতাঙ্গটো দে, লিয়ে যাই।

পিসিমা গুরুদেবের পায়ে পড়ে বললেন, আর দুটো দিন সময় দেবেন ঠাকুর, কোথাও খুঁজে পাচ্ছি নে যে।

জগদীশদা তো থ!

খবরদার পিসিমা, বুড়োকে এ বাড়ি থেকে কোনো জিনিস দিতে পারবে না।

পরে পিসিমা জ্যেঠিমাকে বলেছিলেন যে জগদীশদার যে আবার এত তেজ এ তাঁর ধারণার বাইরে ছিল। বললেন, কি বলব তোদের, ওকে দেখে নেকড়ে বাঘের কথা মনে হচ্ছিল। গুরুদেব বেচারা আর কথাটি না বলে, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে রওনা! একটু টিপিন পর্যন্ত দিতে পারলাম না; মাঝের ঘরে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে জগদীশ বললে, একটা সটির দানা পর্যন্ত দেবে না! উঃ! রাঁধি নি, খাই নি, পেট জ্বলে গেল! ফলপাকুড় কিছু থাকে তো দে।

মা সন্দেশ আর পাকা কলা এনে দিয়ে বললেন, জগদীশ কি খেল ?

পিসিমা বললেন, ও ব্যাটার কথা আর বলিস না। প্রফুল্ল কেবিন থেকে একরাশ গিলে এল। ভাবছি আজ তোদের এখানেই শোব !

আট

সত্যি সত্যি রাতটা পিসিমা থেকে গেলেন। শুলেন আবার আমার খাটে। সারারাত ঘুমুব কি ? খালি খালি ঠাণ্ডা খড়খড়ে পা ছুটো আমার লেপের মধ্যে গুঁজে দিয়ে গরম করতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

হঠাৎ কড়াৎ করে ছিটকিনি খোলার শব্দ শুনে উঠে বসলুম। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি শশীকলাদিদি, টর্চ হাতে নিয়ে, রান্নাঘরের দোরে তালা লাগিয়ে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বিছানায় ফিরে এসে কাউকে কথাটা জানাব কি না ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালে রোজকার মতন শশীকলাদিদিকে ঘোমটা মাথায় ডিম রুটি পরিবেশন করতে দেখে জিগ্গেস করলুম, শশীদিদি কাল রাতে কোথায় গেছলে ?

শশীকলাদিদি এমনি চমকে উঠল যে ঘোমটা খসে গেল, তখুনি সেটাকে টেনে দিয়ে বললে, রাত ছুপুরে আবার যাব কোথায় ?

বললুম, কেন, পষ্ট দেখলুম রান্নাঘরে তালা দিয়ে বেরুলে।

শশীদিদি দারুণ চটে গেল, না বাপু ! বাড়ির ছেলেপুলেরাও পেছনে লাগলে তো পারা যায় না। তা হোলে তো কাজ করা দায় হয়ে ওঠে !

অমনি বাবা, জ্যাঠামশাই, নেপু, বড়দা সবাই আমাকে তাড়া !

খবরদার, ওর পেছনে লাগবে না বলছি। না, না, ও ছেলেমানুষ কি দেখতে কি দেখেছে, ওর কথায় কান দিও না।

তারপর শশীকলাদিদির দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে নেপু জিগ্‌গেস করলে, ও কি? মুখে কাপড় জড়িয়েছ কেন? দাঁত ব্যথা নাকি?

শশীদিদিও অমনি ঘাড় নেড়ে বললে যে হ্যাঁ, ভীষণ দাঁত কনকন!

আমি তো হেসে বাঁচি নে, কারণ ঘোমটা খোলার সময় পষ্ট দেখেছিলুম শশীদিদির গালে চড় খাওয়ার পাঁচ আঙুলের দাগ।

চা খাবার পর পিসিমাকে বাড়ি পৌঁছতে গিয়ে জ্যেঠিমা আর আমি অবাক!

দরজা জানলা সব হাট করে খোলা। জিনিস-পত্র তচনচ। দেয়ালের ছবি ওলটানো, আলমারির বই মাটিতে, তোশক বালিশ ফালা ফালা। ভাঁড়ারের তালা ভাঙা, শিশি বোতল, বাক্স ভাঁড় সব নিচে। বাড়িতে জনমানুষের সাড়া নেই।

এতক্ষণ বাদে পিসিমা ভাঁড়ার ঘরের মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

ওরে জগদীশ, ওরে লক্ষীছাড়া, গুরুদেবকে অশ্রদ্ধা করেছিলি বলেই না তোর এ দশা হল! ভাঁড়ারের এই অবস্থা আর তুই কি আর আছিস রে!

কিছুতেই থামেন না। জ্যেঠিমা পিঠ থাবড়াতে লাগলেন, আমি একটা পুরোনো খবরের কাগজ দিয়ে হাওয়া করতে লাগলুম। কিন্তু পিসিমা সমানে চ্যাঁচাতে লাগলেন, ওরে হতভাগা! তুই মলে আমার প্রজাপতি কে খুঁজে দেবে বল!

ঠিক সেই সময় সামনের স্নানের ঘরের দরজা খুলে, উস্কোখুস্কো চুল আর লাল টকটকে চোখ নিয়ে জগদীশদা বেরুল। জামা-কাপড় ছেঁড়া, গা-ময় কালসিটে আর আঁচড়কামড়। ভাঙা গলায় বললে, থামো দিকিনি!

পিসিমাও অমনি হাত পা এলিয়ে ভির্মি!

সেই সময় লাবণ্যদি আর লতিকাদি এসে না পড়লে কি মুশকিলেই যে

পড়া যেত! জগদীশদা ওঁদের দেখে এক দৌড়ে নিজের ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে ছিটকিনি।

শেষটা লাবণ্যদিরা ধরাধরি করে পিসিমাকে খাটে শুইয়ে মাথায় ঘড়া ঘড়া জল ঢাললেন, তবে পিসিমা চোখ মেলে চাইলেন।

চেয়েই বললেন, বিছানা ভেজালে, এখন শুকুবে কি করে শুনি?

লতিকাদি শুনবেন কেন, বললে, জল ঢালব না তো কি, আরেকটু হলেই যে চোখ উলটে গেছিল! বলে নিজেরাই হাতে হাতে ভাঁড়ার ঘর গুছুতে লেগে গেলেন। আমাকে বললেন, ছোকরা চাকরটা গেল কোথায়, গুদোমে গিয়ে খোঁজ নে।

দেখি সে এইমাত্র কোত্থেকে যেন ফিরে, চকচকে পামসু খুলে রেখে, পা ধুচ্ছে। বলল নাকি অপূর্বদা ওকে কাল রাত নটার বাইস্কোপে পাশ দিয়েছিলেন, ম্যানেজার ওর দোস্ত কি না। রাতে আর ফেরেনি, কোন বন্ধুর বাড়িতে খেয়ে দেয়ে শুয়ে ছিল। এ বাড়ির রাঁধাবাড়ার তো কিছু ঠিক নেই। কাল দুপুরেও দোকানে গিয়ে তেলেভাজা দিয়ে মুড়ি দিয়ে খেয়ে আসতে হয়েছিল। এখানে আর বেশিদিন ওর কাজ করার ইচ্ছে নেই। আরো কি কি যেন বলতে যাচ্ছিল, লাবণ্যদিরা ডাকাডাকি করাতে আর বলা হোল না।

ওর হাতে চিঠি লিখে লাবণ্যদিই থানায় পাঠালেন। জগদীশদা অনেক ডাকাডাকি করাতেও ঘরের দোর খুলল না। শেষটা জ্যেঠিমা পিসিমার কাছে থাকলেন, লাবণ্যদিদিদের সঙ্গে আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। আমার একটুও যেতে ইচ্ছে করছিল না।

ততক্ষণে পিসিমা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেছেন। এঁটে খোঁপা বেঁধে লাবণ্যদিদিদের বললেন, একটু দাঁড়িয়ে যাও বাছা। আমার জন্যে অনেক করলে, দু'জনায় এই শিশি দুটো নিয়ে যাও দিকিনি। ধর লতিকা, লেবুর ঝাল আচার। ওটা সামান্য একটু গেঁজে গেছে, কিন্তু দুদিন রোদ্দুরে দিয়ে

নিলেই কেউ টেরও পাবে না। আর লাবণ্য, তুমি বাছা এই পেয়ারার জেলিটা নিয়ে যাও। কালো দেখে মনে কোর না যে খেতে খারাপ। খারাপ জিনিস আমার হাতে বেরোয়ই না কখনো, তবে ঐ একটু কালচিটে রং ধরে গেছে। এ কি আর আমি সহজে হাতছাড়া করি, নেহাত কোন অজাতে বেজাতে ছুঁয়ে দিয়েছে, তার কোনো ব্যামোট্যামো ছিল কিনা তাই বা কে জানে। আচ্ছা বাছা, এসো তা হলে, আমার এই বেলা অবধি জপ সন্ধ্যে কিছুই হোল না।

এই বলে আমাদের সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। আমাকে কিন্তু কিচ্ছু দিলেন না। অথচ লেবুর আচার, পেয়ারা-জেলি আমিও যথেষ্ট ভালোবাসি।

বাড়ির বাইরে এসেই দেখি শীতের রোদ্দুরে সারা শহরটা ঝিমঝিম করছে। দূরে মাথার ওপর ঘন নীল আকাশে ছুটো চিল ঘুরছে। ঝাউ গাছের পাতা বাতাসে দুলছে, কোত্থেকে যেন কমলালেবুর গন্ধ আসছে। কে বলবে জগদীশদাদের বাড়ির মধ্যে এত কাণ্ড!

আমাদের চান-খাওয়া সারা হয়ে যাবার কত পরে জ্যেঠিমা ফিরলেন। মা আর অরুণাবৌদি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, খিদেও পেয়েছিল বোধহয়, ওঁদের আবার চান করে উঠেই না খেলেই নয়! জ্যেঠিমা এসে ঢুকতেই দুজনে কি হোল, কি হোল করে হামলে পড়লেন।

জ্যেঠিমা মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে, একসঙ্গে খেতে বসে বললেন, সে এক কাণ্ড, বুঝলি মেজবৌ, বাড়িঘর ডালের কাঠি দিয়ে নাড়া, অথচ ঠাকুরঝি বলে কি, না কিছু হারায় নি। আবার হারায় নি বলে রাগ কত! বলে কি না, কই করুক তো কেউ আমার মতো জ্যাম জেলি, অথচ একটা ছোট শিশি অবধি নিল না! কেন, আমার জিনিস খারাপ নাকি? নাকি, তোরাই ভালো জিনিস দেখলে চিনিস্ না? চুরি করতে এইচিস্, অথচ কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ জানিস্ না! এ আবার কেমন ধারা চোর!

শেষটা পুলিশ ইন্সপেক্টর লোকজন নিয়ে এসে পড়াতে পিসিমাকেও থামতে হল, আর জগদীশদাকেও বেরিয়ে আসতে হল। বেরিয়েই পুলিশদের ওপর রাগমাগ করতে লাগল।

ট্যাক্স নেবার বেলায় সব ঠিক আছেন, অথচ নিজের বাড়িতে নিরাপদে ঘুমুতে পারব না, ঠ্যাঙ্গাড়ের দল এসে মেরে পিটিয়ে জিনিস নষ্ট করে দিয়ে চলে যাবে! কেন, থানার লোকেরা করে কি?

কিন্তু জগদীশদা নিজে কিছুই বলতে পারে না। কটা লোক, কোন্ দিক দিয়ে এল, কেমন চেহারা, সঙ্গে হাতিয়ার ছিল কি না কিছুই জানে না।

মা হেসে বললেন, তা জানবে কি করে? সাড়া পেয়েই বোধহয় স্নানের ঘরে ঢুকেছিল। আমি বললুম, ওমা, না, তা হলে অমন বেদম পিটল কি করে ওকে?

ব্যস্, সবাই মিলে আমাকে সে কি বকুনি! জ্যাঠা মেয়ে, বড়দের কথায় কথা বলতে আসে, এইসব। চুপ করে সব শুনলুম, কিচ্ছু বললুম না।

সন্ধ্যেবেলা পড়ছি, নেপু গেছে তার গুরুঠাকুর অপূর্বদার বাড়ি, কি নাকি জরুরী দরকার। হেসে বাঁচি নে। এমন সময় শশীকলাদিদি আস্তে আস্তে দোর গোড়ায় দাঁড়াল।

ও দিদি, সবই তো জানো, এদিকে আমি যে গাল ব্যথায় মলাম। উঃ, দাঁতের গোড়াসুদ্ধ নড়িয়ে দিচ্ছে বোধ হয়! দাও না, ঐ যে কি বড়ি আছে তোমাদের, নইলে আর তো পারছি না!

তাকিয়ে দেখি শশীদিদির গাল ফুলে চালকুমড়ো! বললুম, দেব, যদি বল কে মেরেছে।

শশীকলাদিদি শিউরে উঠে বলল, ও দিদি, দাও দিদি লক্ষ্মীটি, তোমাকে এক্ষুণি গরম পেঁয়াজি খাওয়াব। কুটে রেখে এসেছি ও ঘরে, কড়াইতে তেল ঢেলেছি, দাও দিদি, পায়ে পড়ি!

আমি উঠে বললুম, তা হলে বলবে না? এই আবার বসলুম।

শশীদিদি প্রায় কেঁদে ফেলে, ওকি আবার বসলে কেন ? না দিলে যে মরে যাব। বলব কোন্ সাহসে, ফালা করে চিরে ফেলবে যে। তবু এইটুকু বলছি যে জগদীশবাবুকে রোগা পটকা দেখে মনে কোর না যে ওনার হাতে জোর নেই!—দাও দিদি দুটো বড়ি!

বড়ি নিয়ে শশীকলাদিদি চলে গেলে পর, নেপু এসে জুতো খুলতে খুলতে বলল, অপূর্বদার খুব জ্বর, সর্দিকাশী। বেরুতে পারছেন না, তাই আমাকে একটা কাজ দিয়েছেন।

আমি কিছুই বিশ্বাস করি নি। মুখে বললুম, কাকে ? তোকে ? আর হাসতে পারি নে বাবা।

নয়

অবিশ্যি নেপু কি বলে না বলে আমি থোড়াই কেয়ার করি। তবু এর দুদিন পরে যখন একদিন বিকেলে জঘন্য নোংরা প্যাণ্ট সার্ট পরে এসে, এক ঘণ্টা ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ভিজে হাত দিয়ে চেপে চেপে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, তুই অপূর্বদার যত খুশি নিন্দে করতে পারিস, কিন্তু তোদের নেকি লাবণ্যদিদিমণি দারুণ খাতির করেন। জানিস, ওঁকে এক বোতল পেয়ারা-জেলি পাঠিয়েছেন ?

তখন অবাক্ না হয়ে পারলুম না।

নেপু আমার দিকে না তাকিয়ে, মুখটাকে আয়নার খুব কাছে নিয়ে গিয়ে মাথার মাঝখানকার খাড়া চুলগুলোকে প্লেন করতে করতে বলল, জানিস, অপূর্বদা রোজ সকালে একমণি মুগুর ভাঁজেন। তারপর একপো শেকড়ওয়ালা কাঁচা ছোলা খান। আমাকেও খেতে বলেছেন, তা তোদের বাড়িতে কি ওসব হবার জো আছে ? বলতে না বলতে মা তেড়ে আসবেন! জানিস, অপূর্বদা একবার একটা পাগলা মোষের শিং চেপে ধরে, এমনি করে

এক মোচড় দিয়ে, তাকে রাস্তার মাঝখানে একেবারে কুপো কাৎ—এর বেশী আর বলা হল না, কারণ কায়দাটা দেখাতে গিয়ে, নেপুর হাত থেকে চিরুনী ছুটে গিয়ে, জানালার কাঁচে পড়াতে, কাঁচ ভেঙ্গে চৌচির আর নেপু জিভ কেটে পগার পার। একা একা কত হাসব?

কিন্তু আজকাল আর খেয়ে-দেয়ে কোনো সুখ নেই, বাবা জ্যাঠামশাই-দেরো মন খারাপ! শশীকলাদিদি কেমন যেন বিগড়ে আছে, কখনো বলে দাঁতব্যথা, বলে পেট কামড়াচ্ছে। মোটে রান্নাঘরের দিকে যায় না। মা জ্যেঠিমাকে আবার হাঁড়ি ঠেলতে হচ্ছে।

সবাই মিলে শশীদিদির কম তোয়াজ করা হয় নি। মুখে গলায় গরম জলের সেঁক, কাগজি লেবু দিয়ে কই মাছের ঝোল ভাত, হেন-তেন কত কি। আমার যেন বাড়াবাড়ি মনে হয়, কিন্তু আমাদের কথা তো আর তখন কেউ শুনত না।

ওবাড়িতে জগদীশদার শরীর ভাল নেই, তার ওপর সারাক্ষণ গুম হয়ে থাকে। পিসিমা রোজ রোজ এসে বলেন ওঁর নাকি ভয় ভয় করে। শেষটা মা'দের বলে কয়ে, ওবাড়িতে নেপুর আর আমার শোবার ব্যবস্থা করে নিলেন।

বেশ ভালো লাগত। রাতে আমরা ওখানেই খেতুম। পিসিমা নিজের হাতে লুচি, বেগুন ভাজা, আলুর দম, ক্ষীর, এই সব করতেন। খাবার সময় ওঁদের ছোটবেলাকার কত গল্প বলতেন। জগদীশদার বাবা কি রকম দুষ্ট ছিলেন, আর উনি নিজে কি ভালো! ওঁরা নাকি খুব বড় লোক ছিলেন, পাড়ার লোকের চোখ টাটাত। তারপর জিগ্‌গেস করলেন বোর্ডিং-এর মাসিমার টাকাগুলো ফিরিয়ে দিয়েছি কি না? বললুম, মা রাখতে মানা করেছেন, তাই দিয়ে এসেছি। তাই শুনে পিসিমা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, ঠিক আমার বাবার টাকার মতন দেখতে ওগুলো। ওরি মধ্যে পুলিসরা দু চারদিন এসে জগদীশদাকে দিয়ে সেই রাতের কথা সব লিখিয়ে

নিয়ে গেল। নাকি তিন চারজন দারুণ ষণ্ডা লোক এসে জগদীশবাবুকে চেয়ারের সঙ্গে পিছমোরা করে বেঁধে ফেলেছিল। তবু যখন জগদীশদা বলতে লাগল বাড়িতে আর সোনাদানা কিচ্ছু নেই, তখন নাকি রেগেমেগে, চুল টেনে, কান মলে, একাকার করে দিল।

জগদীশদাও ছেড়ে কথা বলে নি। তবে হাত-পা বাঁধা, কি আর করতে পারে, কষে দু কথা শুনিয়ে দিয়েছে। ব্যাটাদের কান লাল হয়ে উঠেছিল।

পুলিশরা চলে গেলে, পিসিমার ওপর জগদীশদার সে কি রাগ। ওর বিশ্বাস ওর ওপর রেগে, পিসিমার গুরুদেব তাঁর শিষ্যদের দিয়ে এইসব করাচ্ছেন। আমাদের সামনেই পিসিমাকে ডেকে বললে, হীরের প্রজাপতি বসানো ঢাকনিটা কোথায় রেখেছ বলই না। ভুলে গেছি আবার কি রকম কথা? সমস্ত বাড়ি তচনচ করেও পাওয়া যায় না, ও আবার কি রকম লুকোবার জায়গা?

পিসিমা হাউ হাউ করে কেঁদে বললেন, পেলে তো গুরুদেবকেই দিয়ে দিতাম।

নেপু আর আমি সকালে উঠে গিয়ে পড়াশুনা করি, স্নান করে খেয়ে ইস্কুলে যাই, বিকেলে জলখাবার খেয়ে এবাড়ি চলে আসি। সঙ্গে আবার হাতের লেখার খাতা আর পদ্য মুখস্থর বই নিয়ে আসতে হয়।

আমাকে পৌঁছে দিয়ে নেপু অপূর্বদার কাছ থেকে একবার ঘুরে আসে। ফিরে এসে, রোজ মিথ্যে করে বলে—অনাথদার কাছে অঙ্ক বোঝাতে গেছলুম; এই সব। কারণ আজকাল অপূর্বদার নাম শুনলেই জগদীশদা রেগে যায়।

আমাদের বাড়িতে শশীকলাদিদিকে নিয়ে খুব গোলমাল চলেছে। তার নাকি আজকাল রোজ চোখে ব্যথা করে। তাই নিয়েই একদিন রাতে জগদীশদার কাছে এল।

পিসিমা রান্নাঘরে, নেপু ফেরেনি, আমি খাটের পায়ের দিকে মাটিতে বসে ভূতপ্রেত পড়ছি, সেদিকে কারো নজর পড়ে নি।

শশীকলাদিদি খুব গজগজ করতে লাগল, এবার আমার পাওনা টাকা চুকিয়ে দিয়ে ছুটি দিয়ে দেন, বাবু। নইলে একেবারে রাঁধুনী বামনী বনে যাব।

জগদীশদা এক ধমক দিয়ে বলল, গুটে, খবরদার! তোর পেছনে না পুলিশ ঘুরছে? বলেছি তো গোলমাল চুকে গেলে তোকে আমার এখানেই চাকরি দেব। কদিন চুপ করে থাক, যাবার কথা মুখে আনবি নে।

শশীদিদি বললে, কি চাকরি দেবেন বাবু? আমি পাশ করা গোয়েন্দা, আমি তো আর বাবুর্চি নই।

জগদীশদা চটে গেল, চোপ! তুই একটা থার্ড ক্লাশ টিকটিকি কিন্তু ফার্স্ট ক্লাশ বাবুর্চি! যার যেটা কাজ! আর দেখ, ফের যাবার কথা মুখে এনেছিস কি আমি সেই সাইকেলের ব্যাপারটা বলে দেব! তাই শুনে শশীদিদির মুখে আর কথাটি নেই! জগদীশদা আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়, পড়বি তো পড়, আমার হাত থেকে বইটা ঝুপ করে পড়ে গেল।

দুজনেই প্রথমে দারুণ চমকে গেছিল, তারপর আমাকে দেখে সে কি রাগ! ভাগ্যিস ঠিক সেই সময় রাঁধাবাড়া সেরে কলতলা থেকে পিসিমা আমাকে ডাকলেন, নইলে আর রক্ষে ছিল না।

শশীদিদি সুড়ুৎ করে কোথা দিয়ে যে কেটে পড়ল টেরও পেলুম না!

দশ

ভীষণ রেগে গেছলুম। পরদিন সকালে মাকে সব বলে দিলুম। মা তো রেগে কাঁই!

তুমি তো আচ্ছা মেয়ে শশীকলা! কাজকর্মের নাম নেই, দুবেলা থালা থালা ভাত ওড়াবে আর দিব্বিপাড়া বেড়াবে! তোমার মাইনে কাটা হবে!

শশীদিদিও মার মুখের ওপর ভীষণ বেয়াদপি করতে লাগল।

যান, আপনারা অন্য লোক দেখুন গে, এত কাজ আমার পোষায় না। একটা গোটা পরিবারের প্রত্যেকটা লোক যে এরকম সাংঘাতিক পেটুক হতে পারে এ আমি ভাবতে পারতাম না!

তাই শুনে জ্যেঠিমা বৌদি টৌদি সবাই মিলে মহা চেঁচামেচি লাগালেন। তারপর বাবা জ্যাঠামশাইরা বাড়ি ফেরবার আগেই আমাকে শশীদিদির মাইনের হিসেব কষিয়ে, তার হাতে দিয়ে, তাকে বিদেয় করে দেওয়া হল।

আমি বারবার করে বলতে লাগলুম, ও শশীদিদি, যেখানে সেখানে ঘুরো না, তোমাকে পুলিশে ধরবে। সটান্ জগদীশদার কাছে চলে যাও।

শশীদিদির কি দেমাক! চোখ ঘুরিয়ে বললে, সেখানে যেতে আমার বয়ে গেছে। তা আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। একটা চাকরি না হয় খেয়েই দিয়েছ, জানো রাজরাজড়ারা আমাকে লুফে নেবে। কই রাঁধুক তো কেউ আমার মতো হোসেনি কারি! তা যতই লাগানি ভাঙ্গানি কর না কেন!

বলে এক হাত ঘোমটা টেনে বড় বড় পা ফেলে চলে গেল!

রাত্রে আমার কাছে সব কথা শুনে জগদীশদা এমনি রাগারাগি করতে লাগল যে, শেষ পর্যন্ত নেপু, পিসিমা আর আমি আমাদের বাড়িতে চলে আসতে বাধ্য হলুম!

পরদিন সকালে পিসিমা মা জ্যেঠিমার সঙ্গে সঙ্গে তরকারি কুটতে কুটতে বললেন, আসল কথা তোদের বলাই হয় নি। আমার বাবা ছিলেন লাখপতি, কিন্তু এমনি হাড়কিপটে যে লোকে বলত সকালে ওঁর নাম করলে হাঁড়ি ফাটে। তোরা এখানে ওঁর যে নাম জানিস সেটা ওঁর নাম নয় মোটেই। সেই সববনেশে বুড়োর ভয়ে নাম ভাড়িয়ে এখানে এসে ঘাপটি মেরে ছিলেন। এখন পর্যন্ত নাকি লোকে ওঁকে এখানে ওখানে খুঁজে বেড়াচ্ছে!

সে যাক গে, এখানে বাকি জীবনটা ভগবানের নাম করে কাটিয়ে, শেষটা

যখন চোখ বুঁজলেন, থাকবার মধ্যে রইলাম আমি আর জগদীশের বাবা। আর তাল তাল সোনাদানা আর গোছা-গোছা টাকা।

শুনে মা জ্যেঠিমা কুটনো ফেলে গালে হাত দিয়ে বললেন, দেখছ কি কাণ্ড! তা সে সব গেল কোথায়? তোমাদের তো দেখি মাসকাবারে বেশ টানাটানি!

পিসিমা দুঃখু করে বললেন, আরে সে কথা আর বলিস নে! বাবার শ্রাদ্ধের পর কে যে সব চেঁচেপুঁছে নিয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। ঐ যা দুটো একটা বাবার পা টেপার সময় বাঁ হাতে করে সরিয়ে রেখেছিলাম, সে ছাড়া আর কিচ্ছু পেলাম না। আমি আর থাকতে না পেরে বললুম, বাঁ হাতে করে সরানো মানে কি? অমনি মা জ্যেঠিমা চোখ পাকিয়ে উঠলেন, তোর সব কথাতে কি দরকার? যা পড়্‌গে যা!

আমি সরে গিয়ে দরজার ওপাশে বসলাম। পড়া আমার কখন হয়ে গেছে। পিসিমা বলতে লাগলেন, সে এক মজার ব্যাপার। বাবা বলতেন সিন্দুকের মধ্যে কোনো দামী জিনিস রাখতে হয় না। কারণ চোররা এসে আগেই সিন্দুক ভাঙ্গে, বাক্স খোলে। তাই বাবা করতেন কি, গয়নাগাটি টাকাকড়ি পুঁটলি বেঁধে চ্যবনপ্রাশের টিনের পেছনে, চ্যাঙারি করে খাটের নীচে, কাগজে মুড়ে যেখানে সেখানে ফেলে রাখতেন। বাবাও চোখ বুজলেন আর সে-সব হাওয়া! ঐ দু চারটে যা আমার কাছে ছিল, তাইবা রাখতে পারছি কই? জগদীশটা তো অত দামের কৌটো হারালো, হীরের প্রজাপতিটাও খুঁজে পাচ্ছি নে!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, একটু হেসে পিসিমা আবার বললেন, তবে একটা ভালো হয়েছে এই যে সে বুড়োও আরও কৌটো ভরে নাতনীর বিয়েতে সিঁদুর দিতে পারবে না!

সব চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার হল যে প্রায় এক বছর ধরে এত সব হাঙ্গামার পর আবার আমাদের শহর আগেকার মতন চুপচাপ হয়ে গেল। আবার

সবাই বলতে লাগল, এখানে কোনো দিনো কিচ্ছু হয় না, বিশ্রী একটা জায়গা। আবার ডিমওয়ালার, রুটিওয়ালার কাছ থেকে সবাই এর বাড়ির ওর বাড়ির খবর যোগাড় করতে লাগল। আমার একটুও ভালো লাগত না। এত যে জিনিস গেল, চোর ধরা পড়বে কবে?

শশীদিদির জন্য মন কেমন করত, রোজ নেপুকে আমাকে এটা ওটা ভেজে খাওয়াত। অথচ সেই যে চলে গেল আর তার টিকিটির দেখা নেই। নিজের বাক্সটা অবধি নিয়ে গেল না, তাতে অবিশ্যি কাগজ-পত্র ছাড়া কিছু ছিল না। আমরা আবার আগের মত শাক-চচ্চড়ি খেতে লাগলাম। রোজ খেতে বসে বাবারা শশীদিদির জন্যে আক্ষেপ করতেন।

তবে জগদীশদাদের বাড়িতে খানিকটা অদল-বদল হল। সেই যে পিসিমার ওপব চটে গেল, সেই থেকে জগদীশদার পিসিমার সঙ্গে কথা বন্ধ। রোজ রাত্রে এক টুকরো কাগজে পরদিন কি কি খাবে, তার একটা ফর্দ লিখে পিসিমার দরজায় আলপিন দিয়ে এঁটে রাখত!

শেষটা একদিন সন্ধ্যেবেলায় একগাল হাসি নিয়ে আমাদের বাড়িতে দেখা করতে এল। জ্যেঠিমার তক্তপোশের ওপর কেঠো-কেঠো ঠ্যাং দুটো তুলে বসে বললে, কলকাতায় আমার খুব ভালো চাকরি হয়েছে, আমি কাল সকালের মোটরেই চলে যাচ্ছি। দিন, চাট্টি পায়ের ধুলো দিন! তবে ঐ একটা দুঃখ থেকে গেল, গুটেকে হারালাম।

জগদীশদা চলে গেলে আমাদের খুব মন কেমন করছিল। এমন সময় বিকেল বেলায় নেপু বাড়ি এল, মাথা ধরা, পেট ব্যথা আর জ্বর নিয়ে।

নেপুর মাম্প্‌স্ হল, আমার মাম্প্‌স্ হল, বড়দার মাম্প্‌স্ হল, শঙ্কর ঠাকুর দেশ থেকে ফেরবামাত্র ওর মাম্প্‌স্ হল। সব গাল ফুলে চাল কুমড়ো, ইস্কুল যাওয়া, কাজ-কম্ম, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ।

শুধু আমাদের নয়, শঙ্কর সুদ্ধু সকলের মাম্প্‌স্ হল—পিওনদের,

পুলিশদের, দোকানদারদের, মাস্টার মশাইদের, এমন কি ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর পর্যন্ত মাম্প্‌স্‌ হল।

ছেলেদের ইস্কুল, মেয়েদের ইস্কুল, পাহাড়তলীর প্রাইমারি ইস্কুল সব বন্ধ হয়ে গেল। বোর্ডিংএর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যাদের মাম্প্‌স্‌ হয় নি, তাদের সব বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল।

লাবণ্যদি, লতিকাদিও একটা বড় দল মেয়ে নিয়ে কলকাতা চলে গেলেন। যাবার আগে আমাকে কত আদর করে গেলেন।

নেপুর অপূর্বদাও গেলেন। যাবার আগে গালফুলো নেপুকে দেখতে এলেন। উনি চলে গেলে পর নেপু বললে, অপূর্বদা আমাকে একটা ভারী কাজ দিয়ে গেছেন। কি, তা বলব না।

আমার তো শুনতে ভারি বয়ে গেছে! এমনিতেই ভীষণ গাল টনটন করছে, খিদে-খিদে পাচ্ছে।

এগার

আমরা অসুখ করে যে যার বিছানায় পড়ে থাকি। নেপু উঠে মাঝে মাছে ঘুর ঘুর করে বেড়ায়, তবে ঘর ছেড়ে বার হবার হুকুম নেই। খুব জ্বালায় আমাকে। রাতে আমাদের চোখে ঘুম আসে না। মা জ্যেঠিমারা কত রকম গল্প বলেন, ওঁদের ছেলেবেলার গল্প, ভূতের গল্প, জানোয়ারদের গল্প।

কেমন করে জ্যেঠিমার ঠাকুরদাদা নৌকো করে গঙ্গাসাগরে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন! সেখানে পৌঁছবার ঠিক আগে কুয়াশায় চারদিক ছেয়ে গেল, তারপর জোর জল ঝড় উঠল, নৌকো কোথায় ভেসে গেল তার ঠিক নেই। ভোরে দেখেন একেবারে গহিন সাগরে গিয়ে পড়েছেন। জলের মাঝখানে উঁচু উঁচু ছুটো কালো পাথর উঠে রয়েছে। সেই পাথরের ওপর থেকে কি

সুন্দর গান আসছে। মনও কেমন করে, আবার ভয়ও করে শুনলে। মাঝিরা ওঁকে নিয়ে কোনোরকমে নৌকো চালিয়ে এল। ফিরে আবার গঙ্গাসাগরে যখন পৌঁছুল, সবাই বললে বড় বাঁচা বেঁচে গেছ। কিন্তু তার পর থেকে ঠাকুরদাদা কেমন যেন হয়ে গেলেন, আর কোনো সুখ ভোগ ভালো লাগত না তাঁর।

কেমন করে এক সন্ন্যাসীঠাকুর আমার মার দাদামশাইয়ের বাবাকে একটা কালো পাথর দিয়েছিল, বলেছিল তাই দিয়ে যা ছোঁয়াবে তাই সোনা হয়ে যাবে যদি মনে পাপ না থাকে। দাদামশায়ের চোখের সামনে একটা বটফলকে সোনা করে দিয়েও ছিল। কিন্তু সে চলে গেলে পর, আর কিছুকে সোনা করা গেল না। পাপ নেই এমন লোক কোথায় আছে?

বড়বৌদিও বললেন, আমাদের একজন পূর্বপুরুষ একবার ঘোর জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে দেখেন, একজন পরমাসুন্দরী মেয়ে গাছতলায় বসে হাউহাউ করে কাঁদছে। তাকে যত্ন করে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে বাড়ি নিয়ে এলেন, কিন্তু বাড়ি পৌঁছেই মেয়েরা তাকে যেই না চান করাবার জন্যে শ্বেত-পাথরের বাঁধানো চৌবাচ্চায় জলের মধ্যে নামিয়েছে, অমনি সে চিনির মতো গলে গেল! জলের নিচে তার দুহাতের দুখানি মোটা মোটা সোনার বাউটি থাকল। সে বাউটি এখনো আমাদের দেশের বাড়িতে সিন্দুকে বন্ধ আছে।

আমাদের শঙ্কর ঠাকুরও কম্বল মুড়ি দিয়ে, মাথায় মঙ্কি-ক্যাপ পরে দোর গোড়ায় বসে গল্প শুনছিল, সে বললে, আমাদের দেশে সন্ধ্যের পর ওনাদের ভয়ে কেউ পথে বেরুতে চায় না। আমাদের পিস-শাশুড়ী কি যেন মাড়িয়ে, সন্ধ্যেবেলায় পুকুরঘাট থেকে ডুব দিয়ে ভিজে কাপড়ে ফিরছেন, এমন সময় দেখেন কাদের যেন ছোট মেয়ে ঘাটের কাদায় আছাড় খেয়ে পড়ে গেছে।

পিসিমাও অমনি আহা, বাছারে,—বলে ছুড়ে গিয়ে তাকে কোলপাঁজা করে তুলেছেন, আর অমনি ঝোপের আড়াল থেকে সাদা কাপড়-পরা তার মা বেরিয়ে এসেছে। পিসিমা তার কোলে মেয়ে দিয়ে, বাড়ি ফিরে পিদ্দিমের

আলোতে অবাক হয়ে দেখেন যে, তাঁর হাতের শাঁখাজোড়া আর আঁচলের চাবিগাছি আগাগোড়া সোনার হয়ে গেছে।

গল্প বলার মাঝে মাঝে একেকবার সবাই থেমে যাচ্ছে, আর অমনি বাইরের গাছ থেকে পাতা খসার শব্দ, টিনের ছাদের মটমট শব্দ, বাড়ির পেছনে ছোট নদীর ওপারে সরল গাছের বনে হু-হু করে বাতাস দেয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

অদ্ভুত সব চুরির গল্পও হল। তার কাছে আমাদের এখানকার চুরির কথা কোথায় লাগে!

জ্যেঠিমাদের বংশ-পরিচয়তে লেখা আছে যে বাংলা দেশে এসে বসবার আগে, ওঁদের পূর্বপুরুষরা বেহারে কোথাও থাকতেন। তাঁরা নাকি সেখানকার রাজা ছিলেন! একদিন ছেলেরা সব মৃগয়া করতে গেছেন, আর মেয়েরা সেই সুযোগে, দরজায় বড় বড় কুলুপ এঁটে, দাস-দাসী, পাহারা-ওয়ালা, সেপাই সান্ত্রী সব নিয়ে গ্রামের মাঠে ছট্ পুজো দেখতে গেছেন। ভোরবেলা বাড়ি ফিরে দেখেন সব ভোঁ ভোঁ, কোথাও কিছু নেই! বাড়িঘর, পুকুর, বাগান, বাঁধানো ঘাট, কোন কিছুর এতটুকু চিহ্ন নেই। চারদিকে শুধু অসংখ্য হাতীর পায়ের ছাপ। এই সব কারণেই বেহার ছেড়ে ওঁরা বাংলাদেশে এসে বসতি করতে লাগলেন।

জগদীশদার পিসিমাও ক'দিন আমাদের এখানে আছেন। একা বাড়িতে ভয় করে। পূবের আধখানাতে ভাড়াটে এলেই আবার নিজের বাড়িতে ফিরে যাবেন।

ঐ-সব গল্প শুনতে শুনতে পিসিমা একেবারে জেঠিমার গা ঘেঁষে বসে বললেন, বাবা! এসব কথা শুনলেও গায়ে কাঁটা দেয়। তবে এতে অবাক্ হবার কিছু নেই। দশ বছর আগেও—ও বাবা! ওটা কি?

ঠক্ করে কি একটা ভারী জিনিস জানলার একটা সার্শি ভেঙে পিসিমার কোলের কাছে পড়ল। পিসিমা প্রায় ভির্মি যান আর কি!

আমি সেটাকে তুলে দেখি একটা বেশ বড় নুড়ি পাথরের চারিদিকে জড়ানো একটা সাদা কাগজ, তাতে লাল পেনসিল দিয়ে আঁকাবাঁকা হরফে লেখা, 'প্রজাপতির জন্যে ধন্যবাদ'।

চিঠি পড়ে পিসিমার সত্যি সত্যি হাত পা এগিয়ে গেল। জ্যেঠিমার গায়ে একেবারে ঢলে পড়লেন।

এমনি সময় বাবা আর জ্যাঠামশাই ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে কি সব বলাবলি করতে করতে এসে উপস্থিত হলেন। ডাক্তারবাবু আমাদের পেট-টেট টিপে, ওষুধ লিখে দিয়ে বললেন, তারপর তোমাদের গোয়েন্দাগিরির তা হলে এখেনেই ইস্তফা, কি বল নেপুবাবু? নেপু বললে, কেন কেন!

ডাক্তারবাবু খুব হাসলেন, ওমা, খবর শোননি বুঝি? থানায় যে উড়ো চিঠি এসেছে, জঙ্গলের মধ্যে ভূতের বাড়ির দেয়ালের মধ্যে চোরা কুঠরিতে সব চোরাই-মাল গুম করা আছে। আর অর্কিডফুল কোথায় জানো? ম্যাজিস্ট্রেটের সামনের বারান্দা থেকে তুলে নিয়ে, আস্তাবলের পেছনের বারান্দায় ঝোলানো!—আচ্ছা, এবার তা হলে সোনাহানা মুখ করে এই তেঁতো ওষুধগুলো গিলে ফেল দিকি নি। অ্যাঁ, এই ঠিক হয়েছে, এবার বাছাধনরা যে যার শুয়ে পড়তো।

ডাক্তারবাবু ফ্যাচফ্যাচ করে হাসতে হাসতে পাশের ঘরে গিয়ে বসলেন, অনেক রাত অবধি গল্পগুজব চলল। মা জ্যেঠিমারাও কেউ আমাদের ঘরে এলেন না। আমরা খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে, যে যার লেপ গায়ে দিয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, এ আবার কি কথা! চোর কি তা হলে ধরা পড়বে না? যে জিনিস ফিরিয়ে দেয় সে কি চোর?

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাই নি।

বার

পরদিন শহরে সে কি হৈ-চৈ! সে সময়কার কথা বললে সহজে কেউ বুঝতে পারবে না। সারা বছর শহরটা যেন ঘুমিয়ে থাকত, একটা কিছু ঘটলে হঠাৎ জেগে উঠে বসত। তাই নিয়ে সে যে কি উত্তেজনা চলত, যারা আজকাল শহরে বাস করে, তারা কোন মতেই বুঝতে পারবে না।

বাজার পর্যন্ত ভালো করে বসল না সেদিন। সকালে দুধওয়ালা, রুটি-মাখনওয়ালা, ডিমওয়ালা কেউ এল না। মাছওয়ালাও অনেক বেলা করে এসেছিল, তাও নেহাত না এলে মাছ পচে যেতে পারে বল।

দলে দলে সবাই বনের মধ্যে ভূতের বাড়িতে কি পাওয়া গেল দেখতে চলল।

বড়দাও গেছল। এসে বলল, দুটো দেয়ালের মাঝখানে লুকোনো একটি ফালি ঘর। দরজার মাথার ওপর নক্সা-করা একটা ফুল, তারি মাঝখানটা টিপলে,পাশের দেয়ালের খানিকটা ফাঁক হয়ে, গিয়ে, চোরা কুঠরি বেরিয়ে পড়ে।

মাটি থেকে ছাদ অবধি জিনিসপত্রে ঠাসা। যেখানকার যেমন হারিয়েছিল ঠিক তেমনি অবস্থায় রাখা রয়েছে। অবিশ্যি খাবার জিনিস গুলো নেই। ম্যাজিস্ট্রেটের কুকুরটাও নেই।

সারাটা দিন, তারপর আরো চার পাঁচ দিন লেগেছিল, নিজেদের জিনিস চিনে নিয়ে, পুলিশের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনতে।

জিনিস হারানোর সময় যত না হুলস্থূল হয়েছিল, এ তার চাইতেও বেশী হল।

আমাদের বাক্সটাও বন্ধ অবস্থাতেই পাওয়া গেল। বাক্সের ওপর একটা পাথরের থালা চাপানো ছিল, সেটা সুদ্ধু তেমনি রয়েছে।

বিকেলে জ্যেঠিমা বললেন, একে আবার চুরি বলে নাকি? জিনিস না হারালে আবার চুরি কি?

জগদীশদার পিসিমা বললেন, জিনিস হারায় নি তো আমার সোনার কৌটো কই? হীরের প্রজাপতিটে কই? তোদের এত ফুর্তি কিসের গা? চোর ধরা পড়বে না? তার সাজা হবে না? আমার জিনিস ফিরে পাব না?

নেপু বললে, ইস্কুল খুললে, অপূর্বদা এসে একবারটি দেখলেই সব বুঝে নেবেন। অপূর্বদা বলেছেন বিলেতে কিছু চুরি গেলে, ঘরের জিনিসপত্রের ওপর কি একটা গুঁড়ো ছড়িয়ে, তার ফটো তোলা হয়। ব্যস্, চোরের আঙুলের ছাপের ছবি পাওয়া যায়। তাপ্পর আর কি, ঐ ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে দুদিনেই চোর গ্রেপ্তার হয়। দেখিস্ এসেই ঐসব করাবেন।

শুনে পিত্তি জ্বলে গেল। বললুম, রেখে দে তোর গুঁফো মাস্টারের ক্যারদানি! ভূতের ভয়ে রাতে জানলা না বন্ধ করলে যার ঘুম হয় না,তার আবার কথা!

নেপুও চটে গেল, মোটেই ভূতের ভয়ে নয়। ওর হাঁপানির রোগ আছে।

বললুম, রেখে দে তোর হেঁপো মাস্টারের কথা!

নেপু রেগে পেয়ালা থেকে অনেকখানি দুধ মাটিতে ঢেলে ফেলে দিয়ে বললে, রেখে দে তোর ললিতা মাস্টারনীর কথা।

কি রকম আস্পর্ধা দেখলে তো? কিসের থেকে কি টেনে আনা। ঐ বলে আবার দুমদুম করে পা ফেলে খাটে গিয়ে শুল।

সে যাই হোক গে, আস্তে আস্তে সবাই সেরে উঠলুম। মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেলুম, ঘর থেকে ছাড়া পেলুম। মাম্প্‌সের ছুটির সঙ্গে, পুজোর বারোদিন ছুটি জুড়ে, মস্ত লম্বা ছুটির পর শেষটা আবার ইস্কুল খোলবার সময় হয়ে গেল। বোর্ডিংএর মেয়েরা ফিরে এল। শুনলুম ললিতাদি, লাবণ্যদি এসেছেন। নেপুর অপূর্বদাও এলেন।

তখনো ইস্কুল খুলতে দুদিন বাকী আছে, জগদীশদার পিসিমা দিনচারেক হল বাড়ি গেছেন, ও দিকটাতে ভাড়াটে এসে গেছে। হন্তদন্ত হয়ে সন্ধ্যে বেলা আমাদের বাড়িতে ছুটে এলেন। খুশিতে ফেটে পড়ছেন।

ও বৌমা, ওরে মিনু, ওরে নেপু, সুখবর শুনেছিস? ডবল বিয়ের নেমন্তন্ন খাবি যে সবাই। অপূর্বর সঙ্গে লাবণ্যর বিয়ে, আর জগদীশের সঙ্গে লাবণ্যর বোন মলিনার বিয়ে। লাবণ্যর মা'টা সবাই আজ এসে পৌঁছলেন, এখানেই বিয়ে হবে।

বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। লাবণ্যদির সঙ্গে গুঁফো অপূর্বদার বিয়ে তাই কখনো হয় নাকি?

পিসিমা আরো বললেন, নাকি জগদীশদাও আসছে। বিয়ের পর অপূর্বদারাও চলে যাবে। জগদীশদার আপিসেই কাজ করবে। আগেও নাকি তাই করত। জগদীশদার কাজ নাকি ও-ই ঠিক করে দিয়েছিল। কি জানি!

হয়তো সবাই কলকাতায় গিয়ে ট্রামরাস্তার ওপর থাকবেন, ঘড়ঘড় করে সামনে দিয়ে ট্রাম যাবে, মাথার ওপর বিজলি পাখা ঘুরবে, সন্ধ্যে হলে কুলপি বরফওয়ালাকে ডেকে সবাই কুলপি খাবেন।

সেই পাহাড় দেশের প্রচণ্ড শীতে, লেপের ভেতর পা গুটিয়ে শুয়ে, এসব কথা মনে করে দারুণ কান্না পেতে লাগল।

কিন্তু নেপুটার এতটুকু দুঃখ নেই। আবার সে কি ভড়পানি! বললে, ভালোই তো, আসছে বছর আমার বারো পুরবে, তারপর তিন বছর বাদে পরীক্ষেটা কোনোমতে পাশ করে নিয়েই, কলকাতা চলে যাবে! ব্যস্, আর কি? হস্টেলে থাকব, রোজ সন্ধ্যেবেলা অপূর্বদার বাড়িতে গিয়ে মালাই-বরফ খাব। তোর লাবণ্য মাস্টারনী রাঁধতে পারে তো?

চব্বিশ ঘণ্টা কেবল খাবার তালেই আছে। আমি কিন্তু রোজ রাত্রে বালিশে মুখ গুঁজে খুব কেঁদে নিতুম।

ইস্কুলের মেয়েরা সবাই চাঁদা তুললুম। লাবণ্যদিকে খুব ভালো করে ফেয়ারওয়েল দিতে হবে। ‘সুখে থাকো’ লেখা সোনার পিন কেনা হল, সাড়ে তেরো টাকা দিয়ে। তখন সোনা কত সস্তা ছিল; সবাই শাড়ির কাঁধে সোনার পিন লাগাত।

এসব নিয়ে নেপুর সে কি বিশ্রী হাসাহাসি। বলে, কিরে তোদের বালতি-টালতি কেনা হল ? নইলে মেয়েরা চাঁদা করে কাঁদাকাটি করবে কি করে ?

এই ধরনের ঠাট্টা আমি দু’চক্ষে দেখতে পারি নে। তবু চুপ করে থাকলুম, নইলে আরো কত কি বলবে, বিশ্বাস কি।

অরুণাবৌদি কিন্তু আচ্ছাসে ওর কান পেঁচিয়ে দিয়ে বললেন, মেয়েদের একটু সমীহ করতে শেখ্, লক্ষ্মীছাড়া!

তখন একটু না হেসে পারলুম না। লাবণ্যদি নিজে একদিন আমাদের বাড়ি এসে দেখা করে গেলেন। মাখনের মতো রংএর একটি শাড়ি পরে কি যে সুন্দর সে আর কি বলব!

আমার গালে একটা চুমো খেয়ে বললেন, কলকাতায় গেলে, আমাদের বাড়িতে যেও, কেমন ?

শুনে খুব আনন্দও লাগল, আবার কান্নাও পাচ্ছিল। তারপর মা’কে বললেন, শেষটা ভূতের বাড়ি থেকে জিনিসপত্র উদ্ধার হল! সেদিন আমরা যখন সেখানে গিয়ে কানের ফুল কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, তখনি আমার সন্দেহ হয়েছিল। তবে বড্ড অন্ধকার ছিল কি না, ভালো করে খোঁজাই গেল না। নইলে আমরাই হয়তো পেয়ে যেতাম।

সত্যি. কি বুদ্ধি যে লাবণ্যদির। ওঁর বোনকেও সঙ্গে এনেছিলেন, তিনিও ওরি মতন সুন্দরী, তবে আমার ওকে ততটা ভালো লাগে নি। কেমন যেন একটু দেমাকি বলে মনে হল। কথাই বললেন না ভালো করে। তবু জগদীশদার সঙ্গে বিয়ে হলে একটুও মানাবে না মনে হল। কি কাঠ-কাঠ হাত পা জগদীশদার, মাথায় কি কম চুল।

চারিদিকে তখন বিয়ে ছাড়া অন্য কোনো কথা নেই। লাবণ্যদির মা আমাদের জন্যে পুলিপিঠে করে পাঠিয়ে দিলেন। বাবা জ্যাঠামশাই মহা খুশি।

তবু ঐ চুরির কথাটা আমার প্রায়ই মনে হত। আর পিসিমার তো মহা দুঃখ, এদ্দিন বাদে বৌমা আসছে ঘরে, কিন্তু সিঁদুর রাখবার জন্যে হীরের প্রজাপতি বসানো সোনার কৌটোই নেই!

তের

সেকালের ব্যাপার ছিল আলাদা। লোকে থাকত ভারি সাদাসিধে ভাবে। বিকেলে কেউ কারো বাড়ি গেলে, গরম লুচি ভেজে, লাল কাশীর চিনি দিয়ে খেতে দিত। বেশী দামের কাপড়চোপড় পরারও রেওয়াজ ছিল না।

তবে বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে কারো বিয়ে থা হলে পাড়াসুদ্ধু এসে জুটে যেত। পরামর্শ দিত দেদার, সাহায্যও কম করত না।

এক মাস আগে থাকতে হৈচৈ লেগে যেত। মফঃস্বল শহর, সব বন্দোবস্তই আগে থাকতে করতে হত। ব্যবসাদাররা, কারিগররা বায়না নিয়ে, এক মাস আগে থেকেই কাজে লেগে যেত। আর এবার তো মাসখানেকও নেই, তারপর ডবল বিয়ে! ঝগড়াঝাঁটি ভুলে, সবাই মিলে আমোদ করতে লেগে গেল।

কোথায় মেরাপ বাঁধা হবে, ক শো চেয়ার পড়বে, কি খাওয়া হবে, কি দেওয়া হবে, এখন সবার মুখে কেবল ঐ এক কথা।

জগদীশদার পিসিমা নতুন মানুষ বনে গেলেন। আনন্দের চোটে মাথের রঙের রংএর আলোয়ানটা চাকরটাকে দিয়ে দিলেন। কাঁঠাল কাঠের বাক্স খুলে পুরোনো একখানা হলদে হয়ে যাওয়া গরদ বের করে পরলেন।

বাদামী রংএর একটা কাশ্মীরি শাল গায়ে জড়ালেন। গলায় একটা দশভরী বিছে হার পরলেন।

আর দিনরাত কেবল জগদীশদার প্রশংসা। কেমন সোনাহানা মুখ করে যা দেওয়া যায় তাই খায়। সাত চড়ে রা নেই—এই সব। আমরা তো দেওয়ালে সেই পিন দিয়ে কাগজ আঁটার কথা, শশীদিদির গালে চড়ের দাগের কথা মনে করে, হাঁ হয়ে যেতুম।

তার ওপর বৌমাকে আশীর্বাদ করবেন বলে সুন্দর এক পুরোনো গয়নাও বের করলেন। জ্যেঠিমা তো রীতিমতো চটেই গেলেন, কি রকম কঞ্জুষ বুড়ী দেখলি? এতকাল এর বাড়ি ওর বাড়ি ফলপাকুড়টা, ক্ষীর সন্দেশটা খেয়েই বেড়িয়েছে, হাত উপুড় করে একটা পয়সা ঢালে নি। অথচ ঘরে তার এত দামের গয়না!

পিসিমা ওদিকে জাঁক করে বলে বেড়াতে লাগলেন, বাবা, আমি কি তেমনি মেয়ে! কৌটো পাবামাত্র পেতলের হাঁড়িতে উটিকে ভরে, রান্নাঘরের মেঝেতে তিন হাত মাটি তুলে, রাতারাতি পুঁতে ফেললাম। তাপ্পর তার ওপর উনুন পেতে দিব্যি রাঁধাবাড়া করতে লেগে গেলাম! আর এও সত্যি বলছি, তার পর থেকে ডাল ঝোলগুলোও খেতে লাগত যেন মধু! উদিকে দেওয়ালের ওধারে ডাকাতের সর্দার গুটে নিশ্চিন্তে রাঁধছে, আর সুবিধে পেলেই এঘর ওঘর হাতড়ে বেড়াচ্ছে! ঐ কানের ফুলটি ছবির পেছনে লুকিয়ে রেখে ভুলেছিলুম, ব্যস্ অমনি সেটি গাপিয়েছে! কিন্তু এটাতে কিছুতে হাত লাগাতে পারে নি!

বলেই পিসিমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। মা'রা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, ও কি ঠাকুরঝি? বুক ধড়ফড় কচ্ছে নাকি? ওরে, হাতপাখাটা নিয়ে আয়!

পিসিমা মাথা নেড়ে বললেন, না, না, শরীর খারাপ হয় নি, হীরের প্রজাপতি কেমন করে নিল তাই ভাবছি! আবার চিঠি লিখে জানালো সে কথা! অথচ একদিনও চোখে দেখলাম না ওদের!

লাবণ্যদিদিদের বাড়িতে লোক ধরে না। ওঁর মা কাশী থেকে বেনারসি শাড়ি আনিয়েছেন, দূর দূর পাড়া থেকে মেয়েরা তাই দেখতে আসে। তখন এসব শৌখিন জিনিস বেশি দেখবার সুযোগই পেত না কেউ।

কলকাতা থেকে গয়না গড়িয়ে এনেছেন। তবে পিসিমার ঐ পুরোনো কানবালা জোড়ার কাছে সে-সব দাঁড়াতেই পারে না।

দলবল নিয়ে জগদীশদাও এল বিয়ের তুদিন আগে। অপূর্বদার বাড়িতে উঠল সব। এখন দেখি তুজনার ভারি ভাব। অথচ তু'মাস আগেও জগদীশদার কাছে অপূর্বদার নাম করা যেত না!

জগদীশদাকেও চেনা যায় না। এই অল্প সময়ের মধ্যেই চেহারাটা দিব্যি চেকনাই হয়েছে। সিল্কের পাঞ্জাবি, জংলা শাল, সাদা পাম্পসু পরেছে।

তার পরে চল্লিশ বছরের ওপর কেটে গেছে, কিন্তু সেই ডবল বিয়ের কথা আমার আজো মনে আছে। বিয়ের আগের দিন, পাড়ার ছেলেরা পাড়ার ক্লাবের পক্ষ থেকে 'কংস-বধ' থিয়েটার করল। শহর ভেঙ্গে সব দেখিতে এল। সে থিয়েটারের কথাও আমি ভুলি নি। কি সব চেহারা, মঞ্চের ওপর লাফিয়ে চড়ে কংসের সে কি আস্ফালন! এই বড় বড় লাল চোখ ঘুরিয়ে সে কি তর্জন-গর্জন! ভয়ে হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেছল! তারপর ম'ল যখন, উঃ, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম!

তখন সবে শীত পড়ে আসছে, হিমেতে আর চাঁদের আলোতে চার-দিক ঝিকমিক করছে। অথচ এতটা ঠাণ্ডা পড়ে নি যে বাইরে বেরুতে কষ্ট হয়।

মফঃস্বল শহরে তখনকার দিনে বিয়ের খাওয়া-দাওয়াও আলাদা রকমের ছিল। এই বড় বড় লুচি, ছোলার ডাল, কুমড়োর ছোঁকা আর পাঁঠার মাংস। রাঙ্গা আলুর অম্বল, টক দই আর লাল লাল বোঁদে। তার ওপর লাবণ্যদির মা কলকাতার মেয়ে, রাশি রাশি পান্তুয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। সবাই তাঁর খুব প্রশংসাও করেছিল।

লাবণ্যদি আর মলিনাদিকে সেজেগুজে পাশাপাশি বসে, দেখাচ্ছিল যেন পরীদের ছুই রানী!

আমরা সেজেগুজে, ঘুরে ফিরে, খেয়ে দেয়ে, পান চিবিয়ে গাল পুড়িয়ে, এমন ক্লান্ত হয়ে গেছিলাম যে শেষ পর্যন্ত বাড়ি এসে, কাপড়-চোপড় ছেড়ে লেপের মধ্যে ঢুকতে পারলে বাঁচি। নেপু নাকি তেরোটা পান খেয়েছিল। ছুটো পান পাঞ্জাবির পকেটে করে বাড়িতেও এনেছিল, এমনি অসভ্য পকেটে খয়েরের দাগ লাগার জন্যে, তেমনি বকুনিও খেয়েছিল জ্যেঠিমার কাছে।

বড়দা, নেপু, বাবা, জ্যাঠামশাই সব গেছলেন অপূর্বদার আর জগদীশদার বরযাত্রী হয়ে। আমরা মেয়েরা হলুম কনে বাড়ির লোক। এমনি করে সেই ডবল বিয়েটা হয়েছিল।

শুনলুম, লাবণ্যদি মলিনাদি নাকি যমজ বোন, ওদের মা ছুজনাকে সব এক রকম জিনিস দিয়েছিলেন।

তারপর দিন রাত্রে অপূর্বদা আর জগদীশদা সবাইকে বায়োস্কোপ দেখালেন। সেকালে কেউ সিনেমা বলত না, সবাই বলত বায়োস্কোপ। সে শুধু দেখা যেত, কানে শোনা যেত না, ছবির নিচে নিচে কথাবার্তা লেখা থাকত, আর একদল সায়েব মতন লোক কোট পেণ্টেলুন পরে, থেকে থেকে হার্মোনিয়ম, বেহালা, ক্ল্যারিয়োনেট বাজাত।

বায়োস্কোপ দেখানোর পর খুব খাওয়াল অপূর্বদারা, চা, সিঙ্গাড়া, খাস্তা কচুরি আর নানারকম মণ্ডা মেঠাই।

তারপর দিন সকালের মোটরে অপূর্বদা, জগদীশদা, লাবণ্যদি, মলিনাদি দলবলের কয়েকজনের সঙ্গে চলে গেলেন।

আমরাও ফুলের মালাটালা নিয়ে, মোটর আপিসে গিয়ে খুব কেঁদেটেঁদে ওঁদের বিদায় দিলুম। লাবণ্যদিদিদের মা বাকি দলবলের সঙ্গে জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলবেন বলে আরো একদিন থেকে গেলেন।

মোটর ছাড়বার ঠিক আগে, সকলের সামনে তিনি হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে, কোঁচড় থেকে দুটো সিঁদুর কৌটো বের করে, মেয়েদের হাত দিয়ে বললেন, ওরে এগুলো তোদের ঠাকুরদা তোদের জন্যে রেখে গেছিলেন। যত্ন করে রাখিস।

পিসিমা আবার চোখে একটু কম দেখেন, একে ওকে জিগগেস করতে লাগলেন, কি দিল বেয়ান তার মেয়েদের ?

শেষ পর্যন্ত মেয়েরা হাতের মুঠি খুলে কৌটো দুটি তাঁকে দেখাল। লাবণ্যদিদিরটা আগাগোড়া এই বড় বড় মুক্তো বসানো। আর মলিনা-দিদিরটা সোনার তৈরি, গায়ে লাল সবুজ পাথর আর ঢাকনির ওপর এই এত বড় একটা হীরের প্রজাপতি ঠিক যেন এখুনি ডানা মেলে উড়ে যাবে।

পিসিমা সেদিকে একবারটি তাকিয়ে, আঁক্ আঁক্ শব্দ করে, একেবারে মুচ্ছো!

তখন জল কৈ, হাতপাখা কৈ, করে চার পাঁচজন লোক ছুটোছুটি করতে লাগল। তারি মধ্যে মোটর ছাড়বার সময়ও হয়ে গেল। ওঁরাও চলে গেলেন।

বাড়ি ফেরার সময় পিসিমাকে ডাক্তারবাবুর টমটমে তুলে দিয়ে, আর সবাই যেমন সেখানে সেকালে সবাই যেত, হেঁটে চলল।

জোঠিমা তখন লাবণ্যদিদির মাকে বললেন, কিছু মনে করবেন না দিদি, ঠাকুরঝির ফিটের ব্যামো আছে।

বাড়ি এসে মাকে বললেন, ঠাকুরঝিও যেমন! কৌটো যেন ওঁর বাবা ছাড়া আর কারো থাকতে পারে না।

মা আস্তে আস্তে বললেন, যেমন শুনেছিলাম, এটা কিন্তু অবিকল সেই রকম দেখতে।

চৌদ্দ

পরদিন লাবণ্যদিদিদের মারা রওনা হয়ে গেলে পর, সন্ধ্যেবেলা পিসিমা আমাদের বাড়িতে এসে বললেন, ছ্যাখ দিকি কাণ্ড! ও কৌটো যদি আমার সেই হারানো কৌটো না হয় তো কি বলেছি! তা তোরা আমাকে কিছু বলতেই দিলি নে!

জ্যেঠিমা বললেন, বাবা! কি ভয়ে ভয়েই যে কাল দিনটা কাটিয়েছিলাম। খালি ভাবি এই বুঝি তুমি বেয়ানকে বেফাঁস কিছু বলে বস! ঘরের কথা বেয়াই বাড়িতে বলতে হয় না, ঠাকুরঝি।

পিসিমা হেসে বললেন, কেন বলব? ওতো আমার জগদীশের বৌয়ের জন্যই রেখেছিলাম। তা সেই যখন পেয়ে গেল, আমার আর বলবার কি থাকতে পারে? থালি ভাবি কৌটোটা যেমন করেই পাক প্রজাপতিটে পেল কোত্থেকে?

দরজার কাছ থেকে ফস্ করে কে বললে, সে আর আশ্চর্য কি? আপনি নিজেই যখন হাতে করে ওনাদের কাছে তুলে দিলেন।

সবাই হাঁ করে দেখি গুটে সেই হাতকাটা গেঞ্জির ওপর আলোয়ান জড়িয়ে এসে কখন দোর গোড়ায় দাঁড়িয়েছে।

মাথা চুলকে বললে, আমার বাক্সটা নিতে এলাম, মা, সার্টিফিকেটটা ওর মধ্যে কিনা।—ওকি পিসিমা, দরজায় খিল দিচ্ছেন কেন? আমি যাব যে।

পিসিমা দরজায় খিল এঁটে, তাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে, জ্যেঠিমাকে বললেন, বড়বৌ, তুই ছাতাটা নিয়ে এপাশে খাড়া থাক তো দেখি। এই হতভাগা, এবার বল্ ওরা আমার কৌটো কি করে পেল?

গুটে আমতা আমতা করতে থাকে, আমার ওপর কারো চোখ পড়বার

আগেই আমি টুপি করে বাবার বড় চেয়ারটার আড়ালে বসে পড়লুম। কি জানি কখন এরা আমাকে কি বলে বসে!

গুটে হঠাৎ মাথা তুলে বললে, বেশ তবে বলেই ফেলি, আমার আর কি? গোড়া থেকেই শুনুন তবে। একটু বসতে পারি?

বলে মাটিতেই আসন পিঁড়ি হয়ে বসে পড়ে বললে, গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে, যদি একটু চা—

জ্যেঠিমা কর্কশ গলায় বললেন, ঐ কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খাও, বাছা। সব কথা শোনবার পর চা আর মালপো দেব।

গুটে তো মহা খুশি।

তা হলে সব কথাই শুনুন। অপূববাবুদের অবস্থা এককালে খুব ভালো ছিল, আমার বাবা ওঁদের বাড়ির সরকার ছিলেন। আমি ওখেনেই মানুষ হয়েছি। ম্যাট্রিক পাশ করে, গোয়েন্দাগিরি শিখেছি ওনাদের খরচায়। তবে অবস্থা এখন পড়ে গেছে।

গত বছর পূজোর সময় জগদীশবাবু কলকাতা গেছলেন মনে আছে তো? সেইখেনে অপূর্ববাবুদের সঙ্গে আলাপ। লাবণ্যদিদির সঙ্গে অপূর্ববাবুর বিয়ে ঠিক হয়েছে, কিন্তু দিদিমণির মা কিছুতেই বিয়ে দেবে না যদ্দিন না কি এক সোনার কৌটো খুঁজে পাওয়া যায়। ওনার শ্বশুরের জিনিস, কে এক জোচ্চোর বদমাশ চালাকি করে হাতিয়ে নিয়েছে—

এই অবধি বলেই জিভ কেটে, গুটে পিসিমাকে বললে, কিছু মনে করবেন না, পিসিমা, গুটে নস্করের মুখ থেকে সর্বদাই হক্ কথা বেরিয়ে পড়ে।

পিসিমা বললেন, বাজে কথা রাখো! তারপর কি হল?

তারপর আর কি হবে? লাগাও গুটে গোয়েন্দাকে, সে জোচ্চোর বুড়োকে খুজে বের করুক। দেরিও হল না বের করতে, জগদীশবাবুই কথায় কথায় সব ফেঁসে দিলেন। হল কি, লাবণ্যদিদি মলিনাদিদির জন্মদিনে ওনারো নেমন্তন্ন হল। প্রেজেন্ট দিলেন একমুঠো সেকালের টাকা! সে

টাকা তো আপনারা পরে বোর্ডিংএর মাসিমার কাছে দেখেওছেন—যাকগে সে কথা। তাপ্পর আর কি, এখেনে ইস্কুলে সব চাকরি খালি আছে, সেও জগদীশবাবুর কাছেই শোনা। অপূর্ববাবু আপিস থেকে এক বছরের ছুটি নিয়ে এখানে চলে এলেন। লাবণ্যদিদিও মেয়ে ইস্কুলের বড়দিদিমণি হয়ে বসলেন।

আমিও এলাম আমাদের গোয়েন্দা সিণ্ডিকেটের যত সব বেকার গোয়েন্দা জুটিয়ে এনে। কৌটো উদ্ধার করতে হবে তো! লোক নইলে চলবে কেন।

নিজে গা ঢাকা থেকে, ঘরে ঘরে দলের লোক চাকর সাজিয়ে ঢোকালাম। বিশ্বাস না হয় খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন এর মধ্যে সবার বাড়ির এক-আধটা ভালো চাকর ভেগেছে কি না। আমাদের সব ট্রেনিং দেয়া লোক, করুক তো কোনো সত্যি চাকর ওদের মতো কাজ?—একটু চা নইলে সত্যি আর বলতে পারছি নে মা।

জ্যোঠিমা খিল খুলে চা করতে গেলেন, বাকিরা পাহারায় থাকল। কারো মুখে কথা নেই। গুটে বারবার বলতে লাগল, গোয়েন্দাগিরি কি সোজা কথা, পিসিমা? এর জন্যে কি না করতে হয়।

ততক্ষণে চা এসে গেল, চা খেয়ে গুটে বললে, পান। মা পেতলের বাক্স থেকে দুটো পান দিলেন। গুটে বললে, চুন। মা চুন দিলেন। গুটে বললে, হ্যাঁ, তাপ্পর শুনুন। সমিস্যে হল কৌটো জগদীশবাবুদের বাড়িতে থাকলেও, সে বিষয় জগদীশবাবু যে কিছুই জানে না সেটা ঠিক। কিছু মনে করবেন না, পিসিমা, ওনাকে একটু মাছের মুড়ো খেতে বললেন, তাতে বুদ্ধি খোলে। অবিশ্যি আমাদের তাতে সুবিধে হল এই যে ওনার কাছ থেকে মেলা খবর বের করে নেওয়া গেল, উনি আমাদের এতটুকুও সন্দেহ করলেন না।—একটু জল খাব।

এবার অরুণাবৌদি নিজেই কুঁজো থেকে জল ঢেলে দিলে। জল খেয়ে

গুটে বললে, এখন কৌটোটাকে বাইরের হাওয়ায় বের করা যায় কি করে? হরিসভার মহিলাসমিতিতে আমাদের চর ছিল, না পিসিমা, তার নাম কিছুতেই বলব না, তাছাড়া সে এখানে নেইও—সে করলে কি না, পিসিমার প্রাণে চোরের ভয় ঢুকিয়ে দিল। ব্যস্, অমনি কৌটো আলোতে বেরিয়ে এল।

পিসিমা ভাঙ্গা গলায় বললেন, নিলি কি করে?

গুটে তো অবাক! ও আর এমন কি শক্ত? ব্যাঙ্ক তো আমাদের লোকেই ঠাসা ছিল। জগদীশবাবু যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাগজে সই দিচ্ছেন তখন পকেট থেকে কৌটো সরিয়ে, কিমামের শিশিই যদি ভরে দিতে না পারে, তো আবার তারা গোয়েন্দা কিসের? কৌটোর কথা তো ব্যাঙ্ক সুদ্ধু সবাই শুনল, জগদীশবাবু এমনি ফলাও করে বললেন!

কিন্তু ঘরে এনে দেখা গেল কৌটোর মুখের হীরের প্রজাপতিটাই নেই। উঃফ! বাপ্! সেটি বের করতেই তো প্রাণ যাবার যোগাড় হয়েছিল!

জ্যেঠিমা বিরক্ত হয়ে বললেন, কি বলছ, বাছা, গুছিয়ে বল।

গুটে বললে, মানে কি বুঝলেন না? দলের লোকরা মনে করেছিল সাত দিনে কাজ হাসিল করে যে যার চলে যাবে। পিসিমা যদি প্রজাপতি না সরাতেন তো হোতও তাই। আচ্ছা, ওরকম কৌটো এক জায়গায়, প্রজাপতি আরেক জায়গায়, অন্য গয়না অন্য জায়গায়—ওরকম থানে থানে জিনিস রাখবার মানে কি?

পিসিমা বললেন, ওমা, কি বলে! এ আবার কি রকম গোয়েন্দা! এক জায়গায় জিনিস রাখি, আর সব এক সঙ্গে যাক আর কি! তাছাড়া প্রজাপতি তো খুঁজেই পাচ্ছিলাম না। তোমরা কোথায় পেলে?

গুটে বললে, কি যে বলেন পিসিমা, আমরা আর পেলুম কোথায়? এদিকে দলের লোক উসখুস করছে, তাদের কাজ না দিলে নাকি তারা স্রেফ চাকর বনে যাবে। তাই এটা ওটা সরাবার বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল,

হাতসাফাই বিদ্যেটা অন্ততঃ চালু থাকুক। তবে যার যারটা ফিরে পেয়েছে কি না বলুন?

আমি আর থাকতে না পেরে উঠে বললুম, কোথায় সব ফিরে পেয়েছে? আলুগাছ পায় নি, পাঁঠা পায় নি, ম্যাজিস্ট্রেটের কুকুরটা পায় নি।

গুটে বিরক্ত হয়ে উঠল। কি যে বোকার মতন কথা বল দিদি। ইস্কুলে গিয়ে কি শেখো? খাবার জিনিস খেয়ে ফেললে আবার আসবে কোত্থেকে? আর কুকুরটা তো চার পাঁচজনকে কামড়ে টামড়ে পালিয়েই গেল। এতদিনে নাকি ফিরেছে।

হ্যাঁ, কি বলছিলাম যেন?—ও, হ্যাঁ সেই হীরের প্রজাপতিটে কোথাও পাই নে। তার ওপর পিসিমা দিলেন পুলিশ লেলিয়ে, পালিয়ে পথ পাইনে! শেষটা রাতে দলবল নিয়ে ওনাদের বাড়ি সার্চ করা ছাড়া উপায় থাকল না! উঃ! সে কি কাণ্ড! সেইদিন জগদীশবাবু প্রমাণ পেয়ে গেলেন যে অপূর্ব-বাবুরা কি উদ্দেশ্যে ওনার সঙ্গে ভাব পাকিয়েছেন। অবিশ্যি কিছুদিন থেকেই নানান কারণে ওঁর সন্দেহ হচ্ছিল। বিশেষ করে মাসিমার কাছে টাকাগুলো দেখে অবধি। ওটা একটা ভুল চাল হয়েছিল, আমি তখনই মানা করেছিলুম, তা কে শোনে! আমাকে তো সে রাত্রে বিরাশী সিক্কা ওজনের এক চড়ই কষিয়ে দিলেন—এখনো দাঁত কনকনানি যায় নি—আর অপূর্বদার ওপর মহা চটে গেলেন।

জ্যেঠিমা বললেন, অতই যদি চটল তো পুলিশে দিয়ে দিল না কেন তোমাদের সবাইকে বাছা? অত যত্ন করে আমাদের এখানে লুকিয়ে রাখার মানেটা কি?

গুটে তো হাঁ!

বাঃ, তা রাখবেন না? আমার মতন কে রেঁধে খাওয়াতে পারে সেটা বলুন? জানেন, রাজরাজড়ারা—আর পুলিশে দেবেন কি করে? তা হলে লাবণ্যদিদির মা মলিনাদিদির সঙ্গে ওনার বিয়ে দিলেন আর কি!

ঢোক গিলে, পিসিমা বললেন, কিন্তু হীরের প্রজাপতিটা কোথায় পেলে?

গুটে একটু চুপ করে থেকে বললে, কেন, পেয়ারা-জেলির শিশিতে। সেখানে আপনিই লুকিয়ে রেখে থাকবেন। তাপর শিশিসুদ্ধু দিয়ে দিলেন।

পিসিমা পুরো এক মিনিট হাঁ করে গুটের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ঝুপ্ করে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। দরজাটাকে ঠেস দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিলেন, এবার দরজাটাও অমনি হাট করে খুলে গেল। আর গুটেও এতক্ষণ বাদে দরজা খোলা পেয়ে, নিজের বাক্সটা তুলে নিয়ে, চোঁ চাঁ যে দৌড় দিল, আর তাকে দেখি নি।

পনেরো

এ সবের পরে আমাদের সেই পাহাড় দেশের ছোট শহরটা অমনি আবার ঝিমিয়ে পড়ল। ঐ এক বছরের কাহিনী আস্তে আস্তে সবার মন থেকে মুছে গেল। গুটের গল্প সত্যি কি মিথ্যে কিছুই বোঝা যায় নি। পিসিমাও এর পরেই বাড়ি বেচে কাশী চলে গেলেন।

কিন্তু নেপু নাকি কলকাতায় যখন পড়তে গেছিল, অপূর্বদাদের খোলাখুলি জিগগেস করেছিল। তাঁরা সব শুনে শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

বলিস কি রে! ও সিঁদুরের কৌটো দুটো যে তোর লাবণ্যদিদির ঠাকুরদাদা নাতনীদের বিয়েতে দেওয়া হবে বলে কবে থেকে লোহার সিন্দুকে তুলে রেখেছিলেন! গুটেও পিসিমার ভয়ে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলল, আর তোরাও অমনি বিশ্বাস করলি? দেখলি কাণ্ড, অবিনাশ?

আর অবিনাশ বলে অপূর্বদার একতলার ভাড়াটে, এক মুখ দাড়ি গোঁফ সুদ্ধু মাথা নেড়ে বলল, অদ্ভুত! খাসা রাঁধত নাকি ঐ অবিনাশ, নেপুকে খাইয়েছিল।